বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আদি ও মধ্যপর্ব

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী

এস. ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ কর্তৃক ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস
অনুযায়ী **একাদশ ও দ্বাদশ** শ্রেণীর জন্য রচিত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

॥ আদি ও মধ্যযুগ ॥

[একাদশ—দ্বাদশ শ্রেণী]

ডঃ শুভংকর চক্রবর্ত্তী এম. এ., পি. এইচ্. ডি.
অধ্যক্ষ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা
ও
দীননাথ সেন এম. এ., বি. এড্‌
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

সংশোধিত সংস্করণ—১৯৮৪
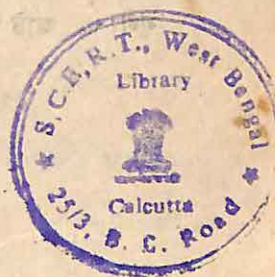
এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

॥ লেখকদের কথা ॥

- উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন পাঠক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে।
  পাঠক্রমের বিন্যাস থেকে মনে হয়েছে সমাজ পটভূমিতে সাহিত্যের ইতিহাসের পঠন-পাঠনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকটি ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে রচিত হ'লো।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকের বই থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি অনেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেবার কারণ, নবীন পাঠার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হবে। পাঠার্থীদের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য কবি-সাহিত্যিকদের মূল রচনা থেকে যথাসম্ভব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে।
- পুস্তকশেষে অধ্যায় ধরে কিছু কিছু প্রশ্নের তালিকা রাখা হয়েছে। একটি আদর্শ প্রশ্নোত্তরও দেওয়া হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পুস্তকে বিন্যস্ত উপকরণ থেকেই প্রশ্নোত্তর লেখার ধারাটি আয়ত্ত করতে পারে।
  যাদের জন্য এই পুস্তক রচিত হয়েছে সেই নবীন বিদ্যার্থীরা উপকৃত হলে উৎসাহিত হবো।

১১. ৭. '৮৪ **গ্রন্থকারদ্বয়**

।। সংশোধিত সংস্করণ ।।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বিদ্যার্থীদের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই সংস্করণ লিখিত হয়েছে।

পুস্তকখানা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক বন্ধুদের কাছে সমাদৃত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সংশোধিত সংস্করণটিও অনুরূপ সমাদর লাভ করবে,—এই আন্তরিক প্রত্যাশা রাখি।

গ্রন্থকারদ্বয়

॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ॥ [আদি ও মধ্যযুগ]

● আদিযুগ

১। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ;
বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন এবং যুগবিভাগ

২। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ— চর্যাপদ সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ

● মধ্যযুগ

১। তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী
(বিঃ দ্রঃ—চণ্ডীদাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই)

৩। ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ
খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

৪। মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন

৫। মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা
(বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

৬। সাহিত্যে ও সমাজজীবনে চৈতন্যদেব

৭। চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা
(দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম)

৮। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়
(চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

৯। বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী

১০। ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা
রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়), প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রবর্তী

১১। কাশীরাম দাসের মহাভারত সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও
শ্রীকর নন্দীর পরিচয়

১২। আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা :
দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওল

১৩। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

১৪। সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)
এবং বাউল (লালন ফকির)

॥ সূচীপত্র ॥

● আদিযুগ

● মধ্যযুগ

॥ আদিযুগ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র তাহাদের প্রাচীন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যসম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাংলা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল তখন বাংলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী হইতে স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া অপভ্রংশ পর্যায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাংলা ভাষা যখন তাহার যথার্থ আদিম রূপ প্রকাশ করিল তখন আদিপর্ব শেষ না হইলেও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এই জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাংলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত।

(নীহাররঞ্জন রায় ; বাঙালীর ইতিহাস)

বাংলা নামে দেশ ॥

'আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে' কবিকল্পনায় যে সুসজ্জিত ভূখণ্ডের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে : উত্তরে সিকিম এবং হিমালয় গিরিশ্রেণী, পূর্বে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, আরাকান শৈলমালা, পশ্চিমে রাজমহলের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত এই ভূখণ্ড আমাদের অখণ্ড বাংলাদেশ। এদেশ জল-বৃষ্টির দেশ। অসংখ্য নদনদী পরিবাহিত এই দেশে বৃষ্টি-বন্যা আর জোয়ারের জলস্ফীতি থেকে জমিকে রক্ষা করার জন্য ছোট বড় বাঁধ বা আল-এর প্রয়োজন। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দের সৃষ্টি। সুপ্রাচীন 'বঙ্গদেশ'-এর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া গেছে। সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় রাজা শশাঙ্কের পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদ লাভ করল ঐক্যবদ্ধ রূপ। আকবরের শাসনাধীনে

সমগ্র বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে অঙ্গরাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হলো। ইংরেজ রাজত্বে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে পরিচয় লাভ করল বাংলা। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও এই হলো তার অখণ্ডিত রূপ। এই রূপের মধ্যেই বাংলা ভাষার বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। "এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।"

বাঙালী জাতি॥

বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ববর্তীযুগে এদেশের অধিবাসীদের জাতিকুল পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে নানা মত রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বোধহয় সকলেই একমত যে, বাংলার মানুষ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ভেড্ডিড জাতীয়ঃ মাথার গড়ন লম্বা, চওড়া নাক, কালো মিশমিশে গায়ের রং, মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন। এই ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে আপামর বাঙালীর শারীরিক সাদৃশ্য বর্তমান। কালক্রমে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণে বাঙালীর নিজস্ব একটা শারীরিক গড়ন দাঁড়িয়ে গিয়েছে যার সঙ্গে পূর্বোক্ত ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর সাদৃশ্যের অল্পবিস্তর পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর্যরা এদেশে আসবার পূর্বে এদেশের মানুষকে, তাদের ভাষাকে, ধর্মকর্ম আচার-আচরণকে তারা অপছন্দ ও নিন্দা করত। ভাষাকে 'বয়াংসি' অর্থাৎ 'পাখির কিচির-মিচির ডাক' বলে উপহাস করত। গৌরবঙ্গে কোনো আর্য দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে এসে পড়লে তাকে ব্রাত্য অর্থাৎ অপাংক্তেয় করে রাখত। আর্যরা তাদের 'আর্যামি'র অহঙ্কার থেকে গৌড়বঙ্গবাসীদের অনার্য (অন্-আর্য) বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই উপেক্ষা, এই উপহাস ও দূরত্বরক্ষা চিরস্থায়ী হলো না। বোধহয় সুজলা, সুফলা, গৌরবঙ্গের সমৃদ্ধিই আর্যদের বাংলাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে। বাংলাদেশে আর্য আগমনের সঠিক সময় কী, তা সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাঙ্লাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন "বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বাঙ্লাদেশে আর্য-উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।" প্রবল ও উন্নত আর্য জাতি বাংলাদেশে এলো তাদের আধিপত্য নিয়ে, ভাষা নিয়ে, তাদের ধর্ম সাহিত্য সামাজিক রীতি নীতি প্রথা নিয়ে। এদেশের পরাজিত অধিবাসীরা তা গ্রহণ করল। দুই জাতির সংমিশ্রণে এক নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটল। **এই জাতিই**

বাঙালী জাতি। নবউদ্ভূত বাঙালী জাতির স্ব-মহিমার ইতিহাস আছে, তার সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরবী ইতিহাস আছে। রাজা শশাংক থেকেই বাঙালী জাতির এই ইতিহাসের যথার্থ পটস্থাপন। গোপাল দেব প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশ বাঙালীর এই ইতিহাসপটকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের যথার্থ জন্ম এই পাল বংশের আমলেই।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ॥

প্রাচীন ভারতের আর্যদের ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সম্মিলনের ফলে নানা ভাষার এক জটিল সংমিশ্রণ ঘটছিল অনবরত। অষ্ট্রীক গোষ্ঠীর ভাষা, কোল মুণ্ডা ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি পরস্পরের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালী তার নিজস্ব একটি ভাষারীতি গড়ে তুলছিল। ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙলাদেশে আর্যভাষা আসিবার পূর্বে এদেশের লোকেরা কোল বা অষ্ট্রীক ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত।" কিন্তু এই আদি বাঙালীর ভাষার কোন লিপিবদ্ধ রূপ ছিল না। ফলে এই ভাষায় রচিত শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের কোন সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে না। ক্রমে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রবল তরঙ্গাঘাতে নিঃশব্দে আত্মলোপ ঘটল প্রাচীন বাংলার নিজস্ব ভাষাসমূহের। খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে পাণিনি আর্যদের 'ছান্দস' ভাষা বা বৈদিক ভাষার সংস্কার-সাধন করেন। সংস্কারপ্রাপ্ত এই ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। কালক্রমে লোক-মুখে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট হতে থাকে। সংস্কৃতের এই ভাঙন থেকে 'প্রাকৃত' নামে এক ভাষা জন্ম নিল। প্রাকৃত ভাষার রূপ প্রধানতঃ তিন প্রকার —মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী। প্রাকৃত ভাষাও কালক্রমে শিথিল হয়ে পড়ল। প্রাকৃত ভাষার এই ভাঙন থেকে জন্ম নিল 'অপভ্রংশ' ভাষা। প্রত্যেক প্রধান প্রাকৃত ভাষা থেকে অপভ্রংশের উৎপত্তি হলো,—মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রি অপভ্রংশ. শৌরসেনী থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী থেকে মাগধী অপভ্রংশ। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে দেখা গেল অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব থেকে প্রাদেশিক ভাষা স্বাতন্ত্র্যলাভ করতে চাইছে। স্বাতন্ত্র্যলাভের এই চেষ্টা থেকেই মাগধী অপভ্রংশের খোলস ফাটিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হলো। এভাবেই পূর্বভারতে মাগধী

অপভ্রংশ থেকেই উৎপত্তি হলো বাংলার সঙ্গে আরও পাঁচটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার,—যেমন অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরিয়া। তাই এই-সব স্বগোত্রীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার আত্মীয়তা নিবিড়। নিচের রূপান্তর চিত্র থেকে সংস্কৃত থেকে বাংলায় শব্দের বিবর্তনের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হবে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	মাগধী অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	পরবর্তী বাংলা
গ্রাম	গাম	গাঁও	গাঁও	গাঁ
কর্কট	কক্কট	কংকড	কংকড়	কাঁকড়া
দুহিতা	ধীআ	ধীঅ	ঝিঅ	ঝি
ভবতি	হোতি	হোই	হোই	হয়

বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ॥

একথা পরিষ্কার যে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশ ক্রমে বিবর্তিত হতে লাগল বাংলা ভাষায়। সৃজ্যমান এই নতুন ভাষা নিশ্চয়ই আঞ্চলিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকত। কিন্তু সংগ্রহের সূত্রে এ যাবৎ প্রাচীন বাংলার যে সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া গেছে তা হল চর্যাগীতিকা। এই চর্যাগীতিকাতেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন।

যুগবিভাগ ॥

বাংলা সাহিত্যের কালক্রমকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়। (ক) আদি-যুগ, (খ) মধ্যযুগ, (গ) আধুনিক যুগ।

ক. খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে তুর্কী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ আনুমানিক ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আদিযুগ। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আদিযুগের ব্যাপ্তি ধরা যেতে পারে। এযুগের প্রামাণিক সাহিত্যনিদর্শন চর্যাপদাবলী। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এই চর্যাগীতিকার রচয়িতা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ডাক ও খনার বচনকে, রূপকথাকে, শৈব নাথধর্মের কয়েকটি গ্রন্থকে, ছড়া পাঁচালি ও বৌদ্ধ শূন্য-পুরাণকে আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনো একমত নন। এ যুগের সাহিত্য হস্তলিখিত পুঁথির আকারেই পাওয়া গেছে।

খ. তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের সূচনা। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৫৭ পর্যন্ত মধ্যযুগ। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগের ব্যাপ্তি ধরা যেতে পারে। এর মধ্যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কালসীমায় বাংলা গ্রন্থের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের সাহিত্যকে বিশেষত্ব দান করে। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে অনেকে এই যুগকে প্রাক্ চৈতন্যযুগ (চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃঃ) এবং উত্তর চৈতন্যযুগ—এভাবেও চিহ্নিত করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর ভাগবত, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, জীবনী-সাহিত্য, গীতিকা-সাহিত্য (মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা) এ যুগের সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। এ যুগের সাহিত্যগ্রন্থও ছিল হস্তলিখিত পুঁথির আকারে।

গ. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ (পলাশীর যুদ্ধ) থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচনা করল। পশ্চিমের সাহিত্য সংস্কৃতির জোয়ার এসে লাগল বাংলার সাহিত্য চিন্তায়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, বাংলা লিপির সুনির্দিষ্ট আকার গ্রন্থাকারে সাহিত্য রচনার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে দিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সক্রিয় উদ্যোগে বাংলা গদ্যভাষার উদ্ভবও এযুগের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এতকাল বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য। ফলে সাহিত্যের বহু দিক ছিল অলিখিত, উপেক্ষিত।

গদ্য ভাষার প্রবর্তনে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র হলো বহুমুখী, বহুধা সম্প্রসারিত। পূর্ববর্তী সাহিত্যঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের আঙ্গিকগত ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য বিস্তর। সাহিত্যের এই কালান্তরে বাঙালী তার সুপ্রাচীন সাহিত্যের উত্তরাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করল নূতন সাহিত্য-সৌধ। বাংলার সাহিত্যকে আঞ্চলিক স্তর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দেবার গৌরব আধুনিক যুগেরই প্রাপ্য।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

নিজ মনে রচি রচি ভব ও নির্বাণে।
বৃথা লোক আপনাকে জড়ায় বন্ধনে॥
আমরা অচিন্ত্য যোগী, মনে নাহি লয়।
জনম-মরণ-ভব কিরূপে বা হয়॥
জনম যেমন হয় মরণও তাই।
জনমে মরণে কোন বিভিন্নতা নাই॥

চর্যাপদ

(চর্যা : মনীন্দ্রমোহন বসু কৃত অনুবাদ)

বাংলার আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু কবিরা ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম-বিশ্বাস কাব্যমাধ্যমে পরিবেশন করলেও জনজীবনের তাঁরা ছিলেন অতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল দ্রষ্টা। এইজন্যই এ যুগের প্রধান প্রধান ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে লোকায়ত জীবনের আন্তরিক ও বিশ্বস্ত চিত্রখানি অঙ্কিত হয়েছে। আদিযুগের একমাত্র প্রামাণিক সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ এই সত্যের ব্যত্যয় নয়।

চর্যার আবিষ্কার॥

এই পদাবলীর আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারে এই পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেন হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা।' এই প্রকাশনায় চারটি গ্রন্থ ছিল—

১. চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, ২. সরহ বজ্রের দোহা, ৩. কৃষ্ণাচার্যের দোহা,
৪. ডাকার্ণব।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের যে পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হয় তা নেপালী অক্ষরে লিখিত প্রাচীন বাংলা। পরে ডঃ প্রবোধ বাগচী চর্যার একটি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই ভূমি থেকে চর্যার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন।

চর্যার ভাষা॥

পণ্ডিতপ্রবর সুনীতিকুমারের বিচারে এগুলির মধ্যে কেবল চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষাই বাংলা। চর্যার এই প্রাচীনতম বাংলায় বেশ কিছু শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং দু'একটি

হিন্দী, মৈথিলী ও ওড়িয়া শব্দও রয়েছে। ভাষাবিদ্ শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন চর্যাপদগুলির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতক। শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। সন্ধ্যাভাষার মানে কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বোঝা যায়, খানিক বোঝা যায় না। পদগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের আভিধানিক-অর্থ এক কিন্তু রূপক-অর্থ আরো গভীর ধর্মীয়তত্ত্বের ইঙ্গিতবহ।

চর্যার কবি সম্প্রদায় ॥

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে মোট পূর্ণাঙ্গ পদের সংখ্যা ৪৬। একটি পদ অসম্পূর্ণ। মোট ২৪ জন পদকর্তা এই পদগুলি রচনা করেন। ভণিতা এবং টীকা থেকে রচয়িতাদের নাম পাওয়া যায়। প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, ভুসুক পাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শবরপাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে প্রাজ্ঞ ধর্মবেত্তা, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরু। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধনার সঙ্কেত বহন করেই চর্যাপদ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

চর্যার উদাহরণ ॥

১

তিন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী ॥
হরিণী বোল তঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো।

(ভীত হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জলপান করে না। হরিণ জানে না হরিণীর নিলয়। হরিণী বলে—হরিণ, শোন, এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত হয়ে চলে যাও।)

২

টালত মোর ঘর নাহি পড় বেষী।
হাড়ীত ভাত ন াঁহি নিতি আবেশী ॥
বেংগ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥

(ঘর আমার টিলার ওপর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই কিন্তু নিত্য অতিথির আগমন হয়। ব্যাঙের সংসার বেড়েই যায়। দোয়া দুধ বাঁটে প্রবেশ করে।)

৩

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহি সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমতো সবরো পাগলো সবরো মা করগুলী গুহাড়া তৌহোরী।
ণিয় ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী ॥

(উঁচু উঁচু পর্বত ; তথায় বাস করে শবরী বালা। পরণে ময়ুরপুচ্ছ, গ্রীবায় গুঞ্জ-মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর গোল করিস না, দোহাই তোর আমি তোরই ঘরণী। নাম সহজ সুন্দরী।)

চর্যার সমাজচিত্র ॥

বাংলার মঙ্গলকাব্যে যেমন বাংলাদেশের জনপদজীবনের বিশ্বস্ত বহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি বাংলার আদি প্রামাণিক সাহিত্য চর্যাপদে বিধৃত রয়েছে হাজার বছর পূর্বেকার বাংলার জনপদ জীবনের বহু প্রত্যক্ষ চিত্র। যদিও ধর্ম সাধনার জটিল নীতিমালা সমস্ত চর্যাপদে রয়েছে, তবু গভীর মরমী দৃষ্টি নিয়ে পদকর্তারা দেখেছেন বাংলার জীবনকে, সমাজকে। তাঁদের দরদী দৃষ্টিতে তাই ধরা দিয়েছে সমকালীন মানুষের দুঃখ বেদনা হাসি কান্নায় আলিম্পিত জীবনযাত্রার অন্তরঙ্গ চিত্র। উপমা রূপক-এ তাঁরা চিত্রিত করেছেন সচ্ছল ও দরিদ্র জীবনযাত্রার নানা দিক।

চর্যার সমকালীন বাংলার নগর সমাজে শিক্ষিত সম্পন্ন বাঙালী নিমগ্ন ছিল বিলাসব্যসনে, অসংযত ভোগবাসনায়। অপরদিকে বৃহত্তর পল্লী-সমাজে, নগরের বাইরে পর্বতাঞ্চলে নিম্নবিত্ত বাঙালীর দুঃখ অভাব ছিল জীবনের নিত্যসঙ্গী। সচ্ছল সম্পন্ন নগরবাসীরা সাড়ম্বরে বিবাহাদি অনুষ্ঠান পালন করত। বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করত। খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেত। মদ্যপান করত। অন্যদিকে নিম্নবিত্তের বহু মানুষের দু'বেলা দু'মুঠো আহার জুটত না। পদ্মের ডাঁটা খেয়ে খিদে দূর করত। নিদারুণ অভাবে অপরাধমূলক কাজ করত। ক্ষুধাতুর শিশুর চোখ ছিল কোটরগত, শরীর শীর্ণ। ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা জল ধরে। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ পোষ্যের সংখ্যা বহু। পরিধানের বস্ত্র জীর্ণ। ভগ্নজীর্ণ কুঁড়ে ঘর। বিভিন্ন পদে এমনিতর দারিদ্র্যের চিত্র প্রকট হয়ে ফুটেছে। "টালত মোর ঘর নাহি পড় বেষী/হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥" ইত্যাদি পদটিতে

রূপকের আধারে জনজীবনের দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ চিত্রণ রয়েছে। নিম্নবর্ণের জীবন-চিত্র বর্ণনার এই প্রত্যক্ষতায় বাংলার আদি সাহিত্যের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হবে। সেদিনের সমাজে বর্ণ বৈষম্য ছিল প্রবল। উচ্চবর্ণের কাছে অচ্ছুৎ অন্ত্যজ ছিল ডোম, নিষাদ। নগরের বাইরে পর্বতাঞ্চলে তাদের বাস। নৌকা ছিল তাদের যান। বাঁশের বা বেতের চাঙাড়ি, চুপড়ি, ধামা, কুলা, বাঁশের তাঁত প্রভৃতি তৈরি করে, কার্পাসের চাষ করে, তাঁতে বস্ত্র বুনে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। নারী পুরুষ উভয়েই কাজ করত। ডোম নারীদের মধ্যে কেউ কেউ নৃত্যবিদ্যায় নিপুণা ছিল। একাধিক চর্যায় রয়েছে শুল্ক সংগ্রহকারীদের উপদ্রব্যের কথা, শান্তিরক্ষীদের অত্যাচারের কথা। একথা স্বীকার করতেই হবে দশম-দ্বাদশ শতকের পূর্বভারতের জনজীবনযাত্রার মূল্যবান দলিল চর্যাপদ।

চর্যার সাহিত্য সম্পদ ॥

প্রধানতঃ ধর্মকৃত্যই চর্যাপদাবলীর উপজীব্য। চর্যার অর্থ-ই কর্মানুষ্ঠান। মহাযানের সাধন পদ্ধতি রহস্যময় ইঙ্গিতে পদকর্তারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং চর্যাপদে সাহিত্যরসতৃপ্তি না ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চর্যাপদাবলীর বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মুগ্ধ দৃষ্টি ছিল ; সে দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে নদীপ্রান্তর-অরণ্য-শোভিত বাংলাদেশ, নরনারীর জীবনের মিলনাবেশ, বিচ্ছেদযাতনা। যে সব পদে এই অনুভব রয়েছে, সে সব পদেই প্রকাশিত হয়েছে কবিত্বশক্তি। পদকর্তার এই ব্যক্তিগত হৃদয় উপলব্ধি চকিত প্রকাশ লাভ করেছে "তিন না ছুপই হরিণা পিবই ন পানী/হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী"—ইত্যাদি পদটিতে। পদটির সন্ধ্যা-ভাষার কুহেলিকার মধ্যেও নরনারীর জীবনের নিবিড় উত্তাপ অনুভূত হয়েছে। এই উত্তাপ ও অনুভূতিতে পদটি কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। বহু চর্যায় পদকর্তারা চিত্র-কল্পনায়, রূপরচনায় অপূর্ব কাব্যস্বাদ সৃষ্টি করেছেন। একাধিক পদে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার নদী তরঙ্গ, পুষ্পশোভা, ছবির মতো সুন্দর গৃহাঙ্গণ, জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রি, মধুময় বাসন্তী প্রকৃতি। রূপক, উপমা ব্যবহারে ভাষা ভঙ্গীমায়, চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে একাধিক চর্যার সাহিত্যগুণ উল্লেখযোগ্য। একটি চর্যায় কবি করুণাকে ডমরুধ্বনি কল্পনা করে গীতি কবির কল্পনা ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানকে জ্যোৎস্না, কায়াকে নৌকা কল্পনায় সাহিত্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাপদের ছন্দ-

বৈচিত্র্য কম। পয়ার ও ত্রিপদীর রূপ দেখা যায় চর্যার ছন্দ বিন্যাসে। অধিকাংশ পদ ষোলো মাত্রার 'চউপাই' ছন্দে সজ্জিত। পদকর্তাদের লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ লোকসমাজ। তাই তাঁরা পরিচিত ছন্দ ও পরিবেশকে বাহন করেছিলেন ধর্ম-বিশ্বাসকে বহুজনগ্রাহ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। ধ্বনিব্যঞ্জনা ও চিত্রসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ গীতিধর্মী চর্যাপদাবলী প্রাচীন বাংলার স্মরণীয় সাহিত্য সম্পদ। চর্যা ধর্মশাস্ত্র হয়েও সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

॥ মধ্যযুগ ॥

তুর্কী বিজয় এবং তার ফলশ্রুতি

জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য, ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, তুকতাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ। বখ্‌ত-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম।
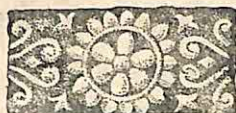
(নীহাররঞ্জন রায় ; বাঙালীর ইতিহাস :)

তুর্কী বিজয় ॥

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বে বাংলার রাষ্ট্রীয় সংগঠনে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবন, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকর্তারা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। আত্মকর্তৃত্বের অদম্য নেশায় মশগুল এইসব অদূরদর্শী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তখন দেখতে পাননি যে কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতার সুযোগে সংঘশক্তির অভাবে কোনো তৃতীয় বিদেশী শক্তি হানা দিতে পারে। সমাজজীবনেও ভাঙন শুরু হয়েছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে জনসমাজে দেখা দিল বর্ণ ও শ্রেণীর জটিল বিভাজন। এই অনৈক্য শুধু যে রাষ্ট্রশক্তিকে দুর্বল করে দিল তা নয়, সমাজের ঐক্যবোধও বিলুপ্ত হলো বর্ণভেদের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ায়। এই ব্যাপক দুর্বলতার সুযোগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী যুদ্ধব্যবসায়ী ইফ্‌তিকারউদ্দিন বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী বিহার অধিকার করে প্রবেশ করলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র পঙ্গু, পরাজয়ের মনোভাবে সমাজ আচ্ছন্ন, অনৈক্যগ্রস্ত জনসাধারণ—এই পটভূমিতে আনুমানিক ১২০২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণে নবদ্বীপের ভাগীরথীতীরে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটল।

প্রতিষ্ঠিত হলো বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী জাতির শাসন এবং একশ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মুসলমান শাসন।

তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতি ঃ সামাজিক অবস্থা ॥

তুর্কী বিজয় বাংলার মোহনিদ্রা ভাঙিয়ে তাকে বিপর্যয়ের মধ্যে জাগিয়ে দিল। বাংলার সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃতিও জাতীয়-জীবনে মধ্যযুগ সূচিত করল এই বিজয়। তুর্কী বিজয়ের প্রথম আঘাতে অন্তত দু'শ বছর ধরে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমগ্র সামাজিক কাঠামো পর্যুদস্ত হলো। বিজয়ী তুর্কীরা বাংলার মানুষের মনে এক আতঙ্ক আগুনের মতো ছড়িয়ে দিল। অমুসলমান কাফের বলে চিহ্নিত করে একদিকে যেমন এদেশীয়দের পীড়িত করতে লাগল, অন্যদিকে পুণ্যকর্ম বলে সব মন্দির, বিহার ধ্বংস করতে উৎসাহিত হলো। গ্রাম-জীবনে তুর্কী সৈন্যরা জোর জবরদস্তি, সন্ত্রাস শুরু করল। ফলে এদেশের অমুসলমান জনসাধারণ হতচকিত, আতঙ্কগ্রস্ত এবং ধর্ম হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। জাতিগত সংগঠন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে তারা বিপদাপন্ন বোধ করল। এই আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলল এই শাসনের প্রথম দিকের চণ্ডরূপ। রাজশক্তির স্বৈরাচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা পলায়নী মনোভাব দেখা দিল। দেশ থেকে, ধর্ম থেকে পলায়নপরতা প্রবল হলো। আস্থাহীন, পাণ্ডুর, বিপর্যস্ত বাংলার সমাজভূমি। এই ভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে সাহিত্যসৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। চতুর্দশ শতকে ইলিয়াসশাহী রাজত্বে দেশে খানিকটা সুশাসন ফিরে আসে। হুশেনশাহী রাজত্বে সমাজে অধিকতর সুস্থিরতা লক্ষ্য করা গেল। হিন্দু রাজকর্মচারী রাজসভায় সম্মানের আসন লাভ করতে লাগলেন। হিন্দু কবি রাজসভাকবির মর্যাদা লাভ করলেন। হুশেনশাহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকে দৃষ্টি দিলেন। চৈতন্যদেবের যৌবনকাল হুশেনশাহী রাজত্বেই অতিবাহিত হয়েছে। হুশেনশাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর বিদ্যোৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার পরিমণ্ডল রচিত হয়। কিন্তু সমাজমনে যে গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, তার রেশ ইলিয়াসশাহী, হুসেনশাহী রাজত্বেও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেল না। আত্মশক্তিতে আস্থাহীন, স্বধর্ম-রক্ষায় অপারগ, স্বৈরাচারে ভীত বাংলার সমাজ ও মন দৈবশক্তির আশ্রয়ে সকল রকম নিরাপত্তা চাইল ও দৈবশক্তির চরণে

জীবনের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা ও মঙ্গলবিধানের প্রার্থনায় আত্মসমর্পণ করল। বিপর্যস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদানের একটা ভূমি রচিত করে দিল তুর্কী বিজয়। তুর্কী বিজয়ের এ এক প্রত্যক্ষ ফল। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গেল মঙ্গলসাহিত্য। নির্যাতিত ও দৈবাশ্রয়ী বাংলার সমাজের নানা ইঙ্গিত রয়েছে মঙ্গলকাব্যসমূহে।

ধীরে ধীরে মুসলমানরা বাংলার সমাজে মাটিতে জন্মে-মরে এই সমাজমাটির আপন হয়ে উঠল। নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দুরা দীর্ঘকাল ধরেই অর্থহীন, প্রাণহীন ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে অবহেলিত, অপমানিত ছিল। ইসলামের মধ্যে তারা মুক্তির স্বাদ পেল,—অনুশাসন থেকে মুক্তি। উচ্চবর্ণের নিরন্তর অবজ্ঞা থেকে মুক্তি। বাংলার প্রবল প্রাণশক্তি ইসলামকে আপন অঙ্গীভূত করে নিল। 'ইসলাম' বাংলার সমাজে ও ধর্মজীবনে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করল। বাঙালীর স্বভাবধর্ম ইসলামের ধর্মসাধনাকে আত্মস্থ করে নিল। লৌকিক ধর্মে গুরু এবং পীর কাছাকাছি চলে এলেন। উভয়েই পূজা পেতে লাগলেন উভয় সম্প্রদায়ের। এভাবে সত্যপীর, মাণিকপীর, বনবিবি, বনদুর্গা, ওলাইচণ্ডী, ওলাবিবি, বড়গাজী খাঁ প্রভৃতি পীরঠাকুর হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত ধর্মজীবনের ঐক্যসূত্রের ধারক হয়ে বাংলার লোকবৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কোনো শাস্ত্র-পুরাণের নির্দেশে নয়, নিতান্ত লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারই জন্ম দিয়েছে এই লৌকিক দেবদেবী সাধক ফকির পীরের। ধর্মমঙ্গলের একটি অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খন্দকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে পরে কালটুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান॥
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল আদম।
গণেশ হইল গাজী কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল মুনিগণ॥

※

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বৈষ্ণব দর্শনের, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব। কিন্তু সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসেও হঠাৎ বা দৈবাৎ কিছু ঘটে না। বৈষ্ণবপুরুষ চৈতন্যদেব সহসা আবির্ভূত হন নি। তাঁর আবির্ভাবের ভূমি রচনার একটি প্রক্রিয়া চলছিল। মালাধর বসু যেমন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সেই প্রক্রিয়া সৃষ্টির অন্যতম একজন, অন্যান্যরা হলেন বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, পদাবলীর চণ্ডীদাস। এঁদের সকলের চিন্তা ও সৃষ্টিকর্ম বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য, সাধনার ভূমি রচনা করেছিল, জনমন প্রস্তুত করে দিয়েছিল। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব, সাধনা, প্রজ্ঞা, ভক্তি সেই ভূমিতে বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে 'নতুন ভাব'-এর লীলাপ্লাবন এনেছে।

কবি-পরিচয়॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবির পরিচয় লাভের উৎস প্রধানত তাঁদের কাব্য। কিন্তু কাব্য থেকেও সবসময় কবির যথেষ্ট পরিচয় লাভ সম্ভব হয় না। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর বিরাট পালাগান 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নিজের সম্বন্ধে খুব অল্পই পরিচয় দিয়েছেন। যেটুকু জানা যায় তা হলো—

(ক) কবি বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন। চণ্ডীর মতো বাসলীও শাক্তদেবী। শাক্ত দেবীর সেবক হয়েও কবি যে রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তার কারণ সে যুগে হিন্দু সমাজে দেব-দেবীর পূজা নিয়ে সাম্প্রদায়িক কলহ প্রায়ই ছিল না।

(খ) কবি তাঁর পালাগানে তিনটি ভণিতা ব্যবহার করেছেন—বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। তবে বেশি ব্যবহার করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা। এর থেকে অনেকে মনে করেন কবির আসল নাম বড়ু চণ্ডীদাস। 'অনন্ত' তাঁর আর একটি নাম হতে পারে।

(গ) কবি বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের লোক ছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেননি। তবে কাব্যের ভাষা থেকে বিচার করে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন, তিনি বাঁকুড়া/বীরভুম/মানভূম অঞ্চলের হবেন।

(ঘ) কাব্য থেকে বোঝা যায় কবি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কবির ব্যুৎপত্তি ছিল। শাস্ত্র পুরাণাদিতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কবি সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন। লোক-জীবনের সঙ্গেও কবি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই লোক-জীবন নির্ভরতার জোরে কবি বিভিন্ন প্রভাবকে স্বী-করণ করে নিয়ে মৌলিক সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কার॥

আবিষ্কার মাত্রেই আলোড়ন বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ১৩১৬ সালে (১৯০৯ খৃঃ) বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির আবিষ্কার বাংলা সাহিত্য-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক ও গবেষক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ থেকে এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। পুঁথিখানি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় নি। খণ্ডিত থাকার ফলে কাব্যের সমাপ্তি কীভাবে হয়েছিল তা যেমন জানা যায় নি, কাব্যখানির মূল নামও জানা যায় নি। পুঁথিখানি তিন প্রকার হস্তলিপিতে লেখা। আবার একই পাতায় দু'প্রকারের হস্তলিপি পাওয়া গেছে। ভাষাও খুব প্রাচীন। ১৩২৩ সালে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জন কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ করেন এবং সাহিত্য পরিষদ্ থেকে এই কাব্যখানা প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ এর নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রাখতে চেয়েছেন। কাব্যখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এতকাল যে বাঙালী সমাজ চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করে আসছিলেন তাঁরা চমকিত হলেন। এ কোন্ চণ্ডীদাস? বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যার কলরব উত্থিত হলো। বসন্তরঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্য-সমাজের এই আলোড়ন-বিক্ষোভ মন্থন করে সমাধান দিতে চাইলেন। কিন্তু এখনও সর্ববাদিসম্মত সমাধান পাওয়া যায় নি।

কাব্য পরিচয় ও কবি প্রতিভা॥

লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়বস্তু করে বাংলা সাহিত্যে বহু আখ্যানকাব্য রচিত

হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ধারার প্রথম আখ্যানকাব্য। ভূভার হরণের জন্য বিষ্ণুর মর্ত্যে কৃষ্ণরূপে এবং লক্ষ্মীর রাধারূপে জন্মগ্রহণ এবং তাদের মিলন লীলাকথাই এই কাব্যের প্রধান কাহিনী। প্রথম আখ্যান হিসেবে এই কাব্যের মূল্য স্বকার করতেই হবে। ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সাহায্য নিয়ে এবং প্রধানতঃ লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীর উপাদান আশ্রয় করে বড়ু চণ্ডীদাস এই পালাগান রচনা করেন। এক্ষেত্রে জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের আদর্শ কবিকে অনুপ্রাণিত করে ; অনেক পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ মাত্র।

কাব্যখানার রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ভাষা, লিপি, সাহিত্যাদর্শ বিচার করে অনুমান করা হয়েছে, এ কাব্যখানা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রচনা।

তেরো খণ্ডে কাব্যখানা বিভক্ত। পুঁথির শেষ অংশ খণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং কাব্যখানা কীভাবে সমাপ্ত হয়েছিল জানা যায় না। চরিত্র আছে প্রধানতঃ তিনটি —কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। পদ আছে মোট চারশ'। কৃষ্ণের জন্ম থেকে কাব্যের শুরু এবং রাধাকে কাঁদিয়ে কৃষ্ণের মথুরায় প্রস্থানে কাব্যের শেষ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বৈশিষ্ট্য লোকজীবন-প্রীতি। বাংলার প্রথম আখ্যানকাব্য লোকজীবননিবিষ্ট—এখানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব। লৌকিক জীবনের আশ্রয় বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের যেমন শক্তি, তেমনি তাঁর কাব্যের সমালোচনার কারণ। কবিশেখর কালিদাস রায় দেখিয়েছেন, এ কাব্যের কাহিনী-স্থান যে গোপপল্লী, তা ভাগীরথী নদী তীরের অশিক্ষিত গোপপল্লী ; বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের যমুনা তীরের বিদগ্ধভাবাপন্ন আভীর পল্লী নয়। এ কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ এই গোপপল্লীরই একটি অমার্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। সুতরাং গোপপল্লীর জনজীবনের গ্রাম্যতা, সামাজিকতা অসামাজিকতা কৃষ্ণচরিত্রে যেমন এসেছে, তা এ কাব্যের কাহিনী, ভাষা, অন্যান্য চরিত্রেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর ফলে এ কাব্যের অমার্জিত বাস্তবতা আরোপিত বলে মনে হয় নি। লোক-জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও আন্তরিকতা স্থানে স্থানেই কাব্যরসোত্তীর্ণ হয়েছে। কবির লোকজীবনচারী প্রতিভার এ হলো প্রশংসার দিক। কিন্তু পরিশীলিত রুচির কাছে এ কাব্যের বাস্তবতা অনেকক্ষেত্রে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বলে প্রতিভাত

হয়েছে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতেও গ্রাম্যতা দোষ ও রুচিহীনতা লক্ষিত হয়েছে। এর ফলে চৈতন্যদেবের কাছে ভাবে ও রসাস্বাদনে এ কাব্য প্রীতিকর ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা ভাষার প্রথম আখ্যানকাব্য এবং এর আখ্যানটি সম্পূর্ণভাবেই লৌকিক। কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ রাধা, কীভাবে কৃষ্ণের কাছে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল, কবি খণ্ডে খণ্ডে সে কাহিনীকে দক্ষতার সঙ্গে বিকশিত করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের নাট্য প্রতিভা ছিল। রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই এই তিন প্রধান চরিত্রের সংলাপে, নাটকীয় দ্বন্দ্বে ও গতিতে, স্থানে স্থানে মনস্তাত্ত্বিক চকিত ইঙ্গিতে এই আখ্যান নাট্যগুণান্বিত হয়েছে। চরিত্রগুলিও নাট্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ কাব্যের কৃষ্ণ গ্রাম্য ছলাকলায়, সরলতায় একটি জীবন্ত চরিত্র। বড়াই কুচুটে চরিত্র হলেও তার মানবিকতাটুকু উপভোগ্য। রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মতো অধ্যাত্মচেতনার স্তরে উন্নীত না হয়ে দেহে-মনে, আত্মস্বাতন্ত্র্যে ও নারীত্বের সবলতা-দুর্বলতায় মানবী রাধা হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-প্রতারিত রাধার হাহাকার একান্ত মর্মস্পর্শী। রাধা চরিত্রকে কবি একটু একটু করে বিকশিত করে পূর্ণস্ফুট চরিত্র করে তুলেছেন। বাংলার প্রথম আখ্যানকাব্যে নায়িকা চরিত্রাঙ্কণে দৃষ্টির এই সামগ্রিকতা, তার সঙ্গে খুঁটিনাটি খুবই প্রশংসনীয়। সমগ্র আখ্যানে পরিচিত বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা বিকীর্ণ। কবির রচনাকৌশলও অনেকক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। রঙ্গ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যেমন এ কাব্যে যথেষ্ট রয়েছে, তারই সঙ্গে কোনো কোনো খণ্ডে, বিশেষ করে বংশী খণ্ডে ও রাধা বিরহে গীতি কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলেঁা রন্ধন।।

* * * *

পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ী জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেই পসিআঁ লুকাওঁ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ।।
আন্তর স্থাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ।। (বংশীখণ্ড)

বড়ুর অনেক পদে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার আভাস পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু সব অভিযোগ জীবনযন্ত্রণার থর থর বুকে প্রেম ও অশ্রুর তর্পণে কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে—বড়ু কবি হয়ে উঠেছেন। এই উৎকর্ষ লক্ষ্য করে অনেকে মন্তব্য করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেখানে শেষ—পদাবলী সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ।

বিদ্যাপতি

জয় জয়দেব কবি   নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
[বৈষ্ণবদাস]

বিদ্যাপতির পরিচয় ॥

এক ছিলেন জয়দেব যিনি বাংলা ভাষায় একটি ছত্রও না লিখে বাংলা সাহিত্যের আদি পদাবলীকার হয়ে রয়েছেন। আরেকজন বিদ্যাপতি। অবাঙালী কবি তিনি। জন্মস্থান দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রাম। মাতৃভাষা মৈথিলী। মৈথিলী ভাষায় তিনি কাব্য সাধনা করেছেন। অবশ্য কোন্ মূল ভাষায় কবি পদ রচনা করেন তা নিয়ে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বাংলা ভাষায় তিনি একটি পদও লেখেননি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য বিদ্যাপতিকে বাদ দিয়ে আলোচনাই করা যায় না। বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের কাছে বড়োই প্রীতিকর ছিল। **বিদ্যাপতিকে বাঙালী যে বাঙালী বলে গ্রহণ করেছে,** তার কারণ বিদ্যাপতির ভক্তিভাব, তাঁর রসচেতনা বাঙালীর ভক্তিভাব ও রসচেতনাকে স্পর্শ করে শত শত বছর ধরে বাঙালীকে আকুল করে তুলেছে। বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরুষ চৈতন্যদেবের বিদ্যাপতি প্রীতি বাংলার কবি গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতির অনুসরণ, বৈষ্ণব মহাজনদের পদ সংকলন গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদগ্রহণ—এসবই বিদ্যাপতির নবজন্ম ঘটিয়েছে বাংলার মাটিতে এবং মধুর রসের রসিক বাঙালীর রসচেতনায়। বিদ্যাপতি তাই বাংলাসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মিথিলার রাজবংশের পঞ্জিকা ও মিথিলার প্রচলিত প্রবাদ ও জনশ্রুতি থেকে সামান্য কিছু জানা গেছে। কবি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। পরমপণ্ডিত শৈব ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। তাঁদের কৌলিক উপাধি 'ঠক্কুর' অর্থাৎ ঠাকুর। মিথিলা যখন মুসলমান শাসনের অন্তর্ভূত হয়, কবি তখন মিথিলার বাইরে অবস্থান করেন। মিথিলায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হলে তিনি স্বদেশে প্রত্যা-

বর্তন করেন এবং রাজ অনুরোধে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ব গৌরব পুনপ্রতিষ্ঠা করতে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মবিশ্বাসে কবি শৈব ছিলেন। কিন্তু অন্তরের ভক্তি কাব্যে যখন প্রকাশ করতে বসেছেন, তিনি কৃষ্ণভক্ত। পদ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি শিবদুর্গা বিষয়ক পদ রচনা করলেও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদেই অন্তরের নিবিড় আকুতি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। কবি মৈথিলী ও সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও অবহট্ট ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর 'কীর্তিলতা' অবহট্ট ভাষায় রচিত।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। তবে বিভিন্ন তথ্যবিচারে অনুমান করা হয়েছে, বিদ্যাপতি ১৩৬০ থেকে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কবির তিরোভাবকাল ১৪৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি।

মৈথিল কোকিল ॥

বিদ্যাপতি সম্পর্কে এই সুপ্রচলিত বিশেষণ বিদ্যাপতির বহুমুখী কবি প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তিনি 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামে তীর্থকৃত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সকল প্রকার দানকর্মের ইতিকর্তব্য নির্ণায়ক গ্রন্থ 'দানবাক্যাবলী', বাৎসরিক পালপার্বন বিষয়ক গ্রন্থ 'বর্যক্রিয়া', গ্রাম নগরের গেজেটিয়ার তুল্য গ্রন্থ 'বিভাগসার', সত্য ঘটনার গল্পরূপ 'পুরুষ পরীক্ষা', পত্রসাহিত্য 'লিখনাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের অক্লান্ত উদ্যমও তাঁর ছিল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের কালসীমায় এক সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃপদের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তবু সমকালীন মৈথিলী কাব্যকুঞ্জ যেন একটি সুস্বর সুদক্ষ কোকিলের প্রতীক্ষায় ছিল। বিদ্যাপতির কবিকণ্ঠে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত কুহুস্বর শোনা গেল। মিথিলার সীমা ছাড়িয়ে এই মৈথিল কোকিলের কাব্যগুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হল উড়িষ্যা থেকে কামরূপ পর্যন্ত। তাঁর পদে কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব দেখে তিনি 'অভিনব জয়দেব' বলেও অভিনন্দিত হলেন।

॥ বিদ্যাপতির পদাবলী ও কবি প্রতিভা ॥

এ পর্যন্ত বিদ্যাপতি রচিত পদের সংখ্যা আটশ' বলে অনুমান করা হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ শতাধিক পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। বাকী পদগুলি অন্যান্য বিষয়ে।

অনেকে বলেন কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু অনেক অনবদ্য প্রতিভার ক্ষেত্রেই এ মন্তব্য সত্য প্রমাণিত হয় নি। বিদ্যাপতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য তাঁর কবিত্বের অনুসরণ করেছে। একদিকে পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে রাজসভার নাগরিকতা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির ভক্তিভাব। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে বিদ্যাপতি উজ্জ্বল প্রতিভায় ভাস্বর হয়েছেন এবং তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী সংযত লাবণ্যে নিটোল হয়ে উঠেছে। কবির কৃষ্ণাকৃতির পদাবলী চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করেছে, গোবিন্দদাসকে আপ্লুত করেছে, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পদমাধুরী প্রভাবিত করেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালী পাঠক-সমাজ বিদ্যাপতির পদাবলীর সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যা-পতির পদ একইসঙ্গে আস্বাদন করে পাঠক আনন্দে অনুভব করেছেন—চণ্ডীদাস 'অনুপাম', বিদ্যাপতি 'রসধাম'। চণ্ডীদাস পাঠককে দুঃখে আপন করেছেন, বিদ্যাপতি সুখে আপন করেছেন।

বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীর বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পর্যায়ে সজ্জিত করেছেন। যেমন পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলনসম্ভোগ, বিরহ, পূনর্মিলন প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর কবি প্রতিভার অনুগমন করেছে। পর্যায়গুলির বিন্যাসে ঘটনাপ্রবাহ আছে, কাহিনীস্বাদ আছে। চরিত্রচিত্রণে বিশেষ করে রাধা চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিতে বিদ্যাপতি নাট্যকার, মনস্তাত্ত্বিক, গীতিকবি। বিদ্যাপতির রাধার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বয়ঃসন্ধি, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর ভাবসম্মিলন প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে। আশ্চর্য চিত্রন কুশলতায় কবি রাধা হৃদয়ের বিচিত্র ভাব-উন্মাদনাকে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপতির রাধা বহুলাংশে মানবী যদিও কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর বিবশ রাধার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝল কৈসন কেল।

লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ল না গেল।

মিলন-বিরহলীলার প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি বিচিত্রসুন্দর। ভাবপ্রকাশে কবি চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতি, এই দুই-ই সমভাবে অবলম্বন করেছেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রকে বিদ্যাপতি উপমা রূপক-এ সজ্জিত করেছেন, সঙ্গীতকে ধ্বনিতে ছন্দে।

হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয় মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখিক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥

এখানে কবি চিত্রে কথা বলেছেন। তুলি হাতে করে বসে যেন এঁকে এঁকে ভাব প্রকাশ করেছেন। আবার,

সখি হমারি দুখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥ ইত্যাদি পদ হৃদয়ের

হাহাকারের সঙ্গীতময় প্রকাশ। চিত্র এখানে আছে। কিন্তু তা দ্বিতীয় অবলম্বন। ভাদ্রপ্রকৃতির বর্ষার সঙ্গে বিরহিত হৃদয়ের দুঃখের বর্ষা একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতিকে মানুষের জীবনবৃত্তে তুলে আনার এই দক্ষতা বিদ্যাপতিকে আধুনিক প্রেম কবিতার পূর্বসূরী কবি করেছে।

বিদ্যাপতির প্রতিভার আরেক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলিতে। ধনজন যৌবনের ঐশ্বর্য আড়ম্বরে কেটে গেছে সারাটি জীবন। জীবনের-মায়া মুগ্ধ কবি কৃষ্ণ চরণ বিস্মৃত হয়ে ছিলেন। কিন্তু জীবনের গোধূলি লগ্নে ভিন্নতর এক হৃদয়ানুভূতি কবিকে ব্যাকুল করে তুলেছে। মাধবের পদপ্রান্তে জীবনসর্বস্ব সমর্পন করেই কবি লাভ করতে চান জীবনাতীত শাশ্বত শান্তি। এ সব পদ কবির আত্মসমালোচনা ও আত্মনিবেদনে উজ্জ্বল। ব্যর্থতার ব্যাকুলতার সঙ্গে মাধবের ওপর নির্ভর বিশ্বাসের মেলবন্ধন ঘটেছে এই পদগুচ্ছে।

তাতল সৈকত বারি বিন্দুসম
সুত-মিত-রমনী-সমাজে।

তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন-দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

●

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের পরিচয়॥

'আমাদের চণ্ডীদাস সহজ কথায় সহজ ভাবের কবি। এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠককে দিয়া লেখাইয়া লন।'—রবীন্দ্রনাথ

চণ্ডীদাস সমস্যার জটিলতায় প্রবেশ করে পণ্ডিতগণ নানা দিক বিচার করে চারজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন—১। বড়ু চণ্ডীদাস ২। দীন চণ্ডীদাস ৩। সহজিয়া চণ্ডীদাস ৪। পদাবলীর চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে অন্য তিনজন চণ্ডীদাসের মধ্যে যিনি শত শত বছর ধরে তাঁর গানে বাঙালীর রসচেতনা ও বাংলার সংস্কৃতি চেতনাকে প্লাবিত করেছেন, স্বয়ং চৈতন্যদেব যাঁর পদ পরম আহ্লাদে আস্বাদন করতেন, জ্ঞানদাসকে পাঠকসমাজ যে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য আখ্যা দিয়েছেন তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাস। পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্য যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু কবির ব্যক্তি-পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ব্যক্তি-পরিচয় চণ্ডীদাসের এখনও অনাবিষ্কৃত কিন্তু পাঠকচিত্তে কবি-পরিচয়ে তিনি অম্লান।

পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ ও কবি প্রতিভা॥

পদাবলীর চণ্ডীদাস সহজ কথার কবি। তিনি সহজ কথা বলেছেন এবং সহজে বলেছেন। তাঁর সব কথা নিবিড় হৃদয়ভাবের কথা বলেই তা সহজ।

রাধার ব্যাকুলতা, রাধার কৃষ্ণ-আকুতি, আক্ষেপ, বিরহ—রাধার পাঁজর ঝাঁঝর করে ঝরে পড়েছে। তাতে কৃত্রিমতা নেই। বিদ্যাপতি যদি হন দেহ ও হৃদয়ের কথার কবি, চণ্ডীদাস অবিমিশ্র হৃদয়ের কথার কবি। পূর্বরাগের পদে, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মাথুরের পদে হৃদয়ের আরতি, হৃদয়ের অনুধ্যান। পাঠক তাঁর হৃদয় দিয়ে রাধার অকৃত্রিম হৃদয়যন্ত্রণা সহজেই আস্বাদন করতে পেরেছেন। হৃদয়ভাবে যদি দুঃখের আবেগ থাকে, পাঠককে তা স্পর্শ করে বেশি। আমাদের মধুরতম গান গভীরতম দুঃখেরই কথা বলেছে। রাধার কৃষ্ণ হাহাকারের মধ্যে শত শত বছর ধরে বাঙালী তাদের প্রেমার্ত হৃদয়কে আবিষ্কার করেছে। তাই চণ্ডীদাস এত সহজবোধ্য, এত প্রিয়।

চণ্ডীদাসের পদ চির পুরাতন হয়েও চির নবীন। তার প্রাচীনত্ব রস মাধুর্যে, ভক্তি-বিনম্রতায়, ক্রান্তদর্শিতায়; তার নবীনতা শাশ্বত মানবিক আবেদনের জয়ধ্বনিতে। চণ্ডীদাসের রাধাচিত্তে যে মানবীর বাস তার ব্যাকুলতা ও বেদনাপ্রকাশের এমন নিরলংকার ভাষা বোধ করি চণ্ডীদাসই একমাত্র জানতেন। তাই কীর্তনের আসরে আপামর শ্রোতৃবৃন্দ আজও সিক্তঅশ্রু আর্দ্রকণ্ঠ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য আত্মহারা হয়ে যান। দুঃখ যে এত সুন্দর, বেদনা যে এত মধুর একথা আগে কে জানত! শ্রীরাধার প্রেম সাধনায় মর্তজীবনের সাথে লোকাতীত ভাবব্যঞ্জনা একাকার হয়ে উঠেছে।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের চিত্রটিও বড় সুন্দর। সর্ব সমর্পিতা রাধা। মিলনের চরম-লগ্নে তার মুখের ভাষা বুকের ভাষা একাকার হয়ে যায়। প্রেমসাধনার শেষ পর্বে দয়িতের পায়ে মাথা রেখে রাধা যখন বলে উঠেন:

বঁধু তুমি আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।।

....

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

তখন মনে হয় গোপাঙ্গনা রাধা চিরকালের পরিচিত প্রিয়া, প্রেমের পুণ্য দীপশিখায় তিনি ভাস্বর। রাধা চরিত্রের এই গভীরতা ও ব্যাকুলতা অন্যত্র দুর্লভ। চণ্ডীদাসের রাধা আবেগে উচ্ছ্বসিত নন, অনুভবে গভীর। রাজসভাকবি বিদ্যাপতির সপ্ততন্ত্রী বীণাধ্বনির ঝঙ্কার এখানে নেই, এখানে শোনা যায় প্রাণস্পর্শী একতারার অনুরণন। পল্লী বাংলার নিভৃত নিরালায় চণ্ডীদাসের হাতে বেজে উঠেছে সেই কাব্যসঙ্গীত। চণ্ডীদাসের রূপ গৌণ, হৃদয়ই মুখ্য।

এই হার্দ্য ভাবকে প্রকাশ করতে চণ্ডীদাস সঙ্গীত রীতিকে প্রধান অবলম্বন করেছেন। সঙ্গীতে কথা বলা কঠিন। কিন্তু বলতে পারলে তা কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল করে তোলে। পাঠক তখন তা সহজে বোঝে। চণ্ডীদাস তাই করেছেন। রাধার অন্তরের বেদনাকে তিনি সঙ্গীতের সুরে বাজিয়েছেন। সঙ্গীতকে উপমা রূপক-এ সাজানো যায় না। এইজন্য চণ্ডীদাসের পদ সরল, অলঙ্কারহীন, সুন্দর। বিদ্যাপতির কলাকুতূহল চণ্ডীদাসে নেই।

প্রকাশভঙ্গীতে বিদ্যাপতি যেখানে চিত্র ও সঙ্গীত এই দুই মাধ্যমেই কথা বলেছেন, চণ্ডীদাস সেখানে কেবল সঙ্গীতকেই মাধ্যম করেছেন। চিত্রে কথা বলার চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কিছুক্ষণের বেশি পারেন নি।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।"

এ-পর্যন্ত চণ্ডীদাস চিত্রে কথা বলতে চেয়েছেন, তারপর আর পারেন নি। "রাই কেন বা এমন হৈল।" বলে কবি ভাবগভীরতায় মগ্ন হলেন—চিত্রের স্থানে সঙ্গীত এলো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি

বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।' চণ্ডীদাসের দুঃখ প্রেমসাধনার দুঃখ। প্রিয়কে ও প্রেয়কে লাভ করতে হয় এই দুঃখ-সাধনার দীপালোকে। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের কবিকল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন শ্রীরাধা। চণ্ডীদাসের পদে যেখানেই দেখি কাব্যের অনুপম উৎকর্ষ সেখানেই শুনি শ্রীরাধার কণ্ঠ। কবির এই বিষাদপ্রতিমা দুঃখের দুস্তর তপস্যায় আত্মবিস্মৃতা। মানুষের সংসার-সীমা ছাড়িয়ে সুদূর অনুভবের জগতে তাঁর অধিষ্ঠান।

চণ্ডীদাসবাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।

সহজিয়া সাধকের এই অকথিত প্রেমানুভূতি চিরকালের মানুষী প্রেমের কথা।

প্রাণের কথা সহজ কথা। চণ্ডীদাস তাকে সঙ্গীতে বলতে পেরেছেন বলেই চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সমগ্র পাঠক সমাজে বুকের আরতিতে অভিষিক্ত। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুসলমান নরনারীর মিলনমেলার প্রেম-গীতিহার, বধূর গলার অলঙ্কার।

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈও তুমি।"

এ আকাঙ্ক্ষা দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে প্রিয় হৃদয়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। বাঙালী মুসলমান কবি যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয় নিয়ে পদ রচনায় আকৃষ্ট হয়েছেন, সে চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের এই হৃদয়ব্যাপ্তি আস্বাদন করেই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রেমভাব আধুনিক বাংলা প্রেম কবিতার পথ তৈরি করে দিয়েছে।

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ

"এই কাব্যটির কেন্দ্রস্থলে আছেন সীতা। সীতা মানে যে হলরেখা একথা সর্বজনবিদিত। রামের দুর্বাদলশ্যাম বর্ণের দ্বারা বোঝা যায় রাম বস্তুত কৃষিজাত শস্যশ্যামল রমনীয়তার নামান্তর। ...মহাবল দশানন সমস্ত লোককেই (ভয়ে) রব (আর্তনাদ) করিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় রাবণ। এই রাবণ নামের স্বার্থকতা আরো স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি যে, তাঁর পুত্র ছিলেন মেঘনাদ এবং সহোদর বিভীষণ। এই বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস হচ্ছে স্বর্ণ বা ধন। এই ধনের লোভে আকৃষ্ট করে স্বর্ণাধিকারী যে কৃষিজীবীকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে মায়াবী স্বর্ণমৃগের লোভে লুব্ধ সীতা-হরণের কাহিনীর মধ্যে। যে স্বর্ণমৃগটি সীতাকে লুব্ধ ও রাম-লক্ষ্মণকে (অর্থাৎ কৃষিজাত শোভা ও সম্পদকে) বিপন্ন করেছিল তার যথার্থ নাম হচ্ছে মারীচ অর্থাৎ মরীচিকা। স্বর্ণ মরীচিকায় মুগ্ধ মানুষ কিভাবে স্বর্ণাধিকারী রাক্ষসের কবলে পড়ে শোভাসম্পদহীন হয় তার পরিচয় শুধু ত্রেতা-যুগের কাহিনীতে নয় বর্তমান যুগেও আমরা নিত্য দেখতে পাচ্ছি।"

(প্রবোধচন্দ্র সেন : রামায়ণের রূপকার্থ)

কৃত্তিবাসের পরিচয় ॥

রামায়ণ পাঁচালীর প্রারম্ভে কবি আত্মবিবরণী দিয়েছেন, তা থেকে কবির জীবন-কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। কবি কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলেন বনমালী ওঝা, মাতা মালিনী দেবী। কবি তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশে প্রমাদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বর্তমান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির জন্মতারিখটি আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত হয় নি। ফলে কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেন নি। কবির জন্মসন ১৪১০ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমিত। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবি যে তাঁর রামায়ণ রচনা করেন এ বিষয়ে সকলেই একমত। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালেই কিশোর কৃত্তিবাস পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তি অর্জন করেন। তার কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ কবিকে পুষ্পমালা দিয়ে সম্বর্ধ্িত করেন।

গৃহে ফিরে কৃত্তিবাস অধিকতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য বাংলায় রামায়ণ রচনার মতো এক কঠিন কাব্যকর্মে মনোনিবেশ করলেন এবং সংস্কৃতের জটাজাল থেকে রামায়ণ মহাকাব্যের রসধারাকে মুক্ত করলেন। রচিত হল বাংলার জাতীয় কাব্য রামায়ণ পাঁচালী।

রামায়ণ পাঁচালী ॥

কাব্যরীতির সংজ্ঞায় মহাকাব্য রূপে পরিগণিত, তবু কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণকে বলা হয়েছে পাঁচালী। এই সংজ্ঞা কবিপ্রদত্ত। কিন্তু কেন এইরূপ নামকরণ? সেকালে রচিত কাব্যের রূপ ছিল দুটি—পাঁচালী ও পদাবলী। পদাবলী সম্পূর্ণতই গান কিন্তু পাঁচালী একটি কাহিনীনির্ভর গীতি-কাব্য। দীর্ঘ এই পাঁচালীর অংশ বিশেষ গীত হত কিন্তু অধিকাংশই পরিবেশিত হত আবৃত্তির মাধ্যমে। এই বিচারে রামায়ণের বৈশিষ্ট্য ছিল পাঁচালীর। দ্বিতীয়ত, বাল্মীকির মতই কৃত্তিবাস কেবল মহাকাব্য রচনা করতে চান নি, তাঁর অভিপ্রায় ছিল তাঁর এই কাব্য গীত হোক, জনপ্রিয় হোক। তৃতীয়ত, তিনি বুঝেছিলেন পাঁচালীর আকারেই রামায়ণ আপামর বাঙালীর কাছে সমাদৃত হবে। রামায়ণ থেকে বাঙালী তাদের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করবে।

কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ॥

বাল্মীকির কাব্য যদি উৎস হয় কৃত্তিবাসের পাঁচালী সেই উৎসের ঝরণা ধারা। কৃত্তিবাস তাকে বাংলার সমতলে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' যখন হিন্দী সাহিত্য ও লোকসমাজে নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণও বাংলার মৌলিক সম্পদ হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে বাঙালী মানসের আশা-আকাঙ্খা ও আদর্শকে তৃপ্ত করে চলেছেন কৃত্তিবাস। বস্তুতঃ এই সর্বপ্লাবী প্রবহমানতা সৃজনেই কৃত্তিবাসের মৌলিকতা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির অনুবাদ নয়। মৌলিকতার গুণেই তিনি বিশ্বসাহিত্য রসিক মধুসূদনের প্রশস্তি লাভ করেছেন: 'এ বঙ্গের অলংকার।'

বাঙালীর কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা ও রুচি বিবেচনা করে কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অম্বরীষের যজ্ঞ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র দ্বন্দ্ব, দশরথের যজ্ঞ প্রভৃতি কিছু অংশ বর্জন করেছেন; আবার সংযোজন করেছেন তরণীসেন, অহিরাবণ, মহীরাবণ বধ,

রামের চণ্ডীপূজা, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি লোকবৃত্ত থেকে আহরিত কিছু উপাখ্যান। বাঙালীর ভক্তিভাব ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকর কিছু প্রসঙ্গ চয়ন করেছেন বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী থেকে। মহাকাব্যোচিত ধীরোদাত্ত ভঙ্গীর পরিবর্তে এনেছেন আটপৌরে ঘরোয়া পরিবেশ।

পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, ন্যায়নীতিবোধ, পাতিব্রত্য প্রভৃতি বাঙালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে এ কাব্যে। কৃত্তিবাসের রাম আর্যসংস্কৃতির ধারক পুরুষ নন, তিনি ন্যায়নীতিপরায়ণ, সদাচার সৌজন্যে মণ্ডিত আদর্শ বাঙালী। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম বাঙালীর অনুকরণীয়। শান্ত-সহিষ্ণু স্বভাবে সীতা বাঙালীর আদর্শ গৃহবধূ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলার গৃহজীবনের স্বচ্ছ দর্পণ। এখানেই কৃত্তিবাসের অনন্য মৌলিকতা।

সীতা বিনা মোর প্রাণ তিলেক না রয়।
কান্দিতে কান্দিতে বলে দুই ধারা বয়॥
কহরে লক্ষ্মণভাই কি করিব আর।
সীতা বিনা দশ দিগ হল্য অন্ধকার॥
আমি আর না যাইব আপন নগর।
সীতা বিনা প্রবেশিব অগ্নির ভিতর॥

সীতাহারা রামচন্দ্রের এই হাহাকার বাঙালীকে মুহূর্তেই অশ্রুসিক্ত করে তোলে। করুণ রসের ধারায় অবগাহনে অভ্যস্ত বাঙালী বেদনার্দ্র কোমলতার স্পর্শে তৃপ্তি লাভ করে। কৃত্তিবাস বাঙালীর এই কারুণ্য-প্রীতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। কৃত্তিবাস জানতেন বাল্মীকির দেশকালপাত্র বাঙালীর মানসক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, সময়ের ব্যবধানও বিস্তর। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব—তিনি এই কালদূরত্ব থেকে রাম-কাহিনীকে নিয়ে আসতে পেরেছেন বাংলার স্নিগ্ধ-শান্ত গৃহস্থজীবনের সীমানায়। এই দুরূহ কাব্যকৃতি মৌলিক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। এইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মৌলিকতাই তাঁকে অমর করে রেখেছে। আজ তাই 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা ॥

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

কৃত্তিবাসের এ অহঙ্কার কালের বিচারে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কি মধ্যযুগ, কি আধুনিক কাল—আপামর বাঙালীর হৃদয়ে এমন শ্রদ্ধার, এমন গৌরবের আসনে আর কোন কবিই বোধ করি স্থান করে নিতে পারেন নি। শত শত বছর ধরে ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটিরে, গবেষকের গ্রন্থাগার থেকে অখ্যাত যাত্রার আসরে—সর্বত্রই কৃত্তিবাসের অবারিত গতি, সর্বত্রই অকুণ্ঠ সমাদর।

এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রথম কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের গার্হস্থ্য জীবনরস। এ কাব্য মঙ্গল সাহিত্যের মত কোন দেবী মাহাত্ম্যের জয়ধ্বনিতে মুখর নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের মত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত নয় কিংবা সংসারবিমুখ বাউলতত্ত্বের ঔদাসীন্যের সুরও এতে নেই। এ কাব্যে ধর্ম আছে, দেবতা, অবতার সবই আছে কিন্তু প্রবলতরভাবে আছে বাঙালীর গৃহজীবন। পিতৃভক্তি, পতিপ্রেম, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা এইসব পারিবারিক বন্ধনগুলি বাঙালীর গৃহজীবনকে সুখের করেছে। কৃত্তিবাস সেই সুমধুর গৃহবন্ধনগুলিকে সুচিত্রিত করেছেন। মানবিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠা, গৃহজীবনাদর্শের ছায়াপাত—এ গুণেই কৃত্তিবাসকে মূল্যবান অলঙ্কারের মত বক্ষে ধারণ করে রেখেছে বাঙালী।

বাঙালীর ঘরে ঘরে রামায়ণ পাঁচালীর যুগোত্তর জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ কৃত্তিবাসের আঙ্গিক রচনার অন্তরঙ্গ ভঙ্গী। বাল্মীকির অবতারবরিষ্ঠ রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের হাতে বঙ্গসন্তানের চেহারা নিয়ে এসেছে। মহাকাব্যিক ক্ষাত্রবীর্যের পরিবর্তে কৃত্তিবাসের রাম লক্ষ্মণ হয়ে উঠেছে বাঙালীর নিত্যপরিচিত বঙ্গ যুবক। রামায়ণ পাঁচালীর বর্ণিত ঘটনার বিষয়বস্তু বাঙালী ঘরের পরিচিত পরিবেশ। এমন কি ছন্দের ক্ষেত্রেও কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন পরিচিত পাঁচালির ছন্দ। কৃত্তিবাস বাংলার গাছপালা, পশুপাখি, খাদ্যদ্রব্যকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে অযোধ্যা এসে দাঁড়িয়েছে বাংলায়।

সমাদরের তৃতীয় কারণ লৌকিক কাহিনীর অনুসরণ। বাল্মীকি রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কৃত্তিবাস একাধিক লৌকিক উপাখ্যানকে সন্নিবিষ্ট করেছেন যার উৎস পুরাণে নেই, আছে বাঙালীর লোকবৃত্তে। লব-কুশের যুদ্ধ কিংবা তরণীসেন, অহিরাবণ বধের কাহিনীতে বাঙালীর পরিজ্ঞাত বীরত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। এইসব কাহিনীর কৌতুক, ভক্তি, রোমাঞ্চ পরম উপভোগ্য। লোকায়ত জীবন থেকে আহরিত এই কাব্যানুষঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী দাগ কাটতে পেরেছে বাঙালীর মনে।

জনপ্রিয়তার চতুর্থ কারণ রামায়ণের বিনম্র ভক্তিভাব ও মর্মস্পর্শী করুণরস। শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় স্তরের ভক্তিধারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে রামায়ণে। শ্রীরামের অকাল-বোধনে আছে শক্তিভাবনা, মুমূর্ষু রাবণের উক্তিতে ভক্তির উচ্ছ্বাস। তরণীসেন কাহিনীতে অনুরণিত হয়েছে বৈষ্ণবভাবনা। সীতার বনবাস বাঙালীকে চোখের জলে ভাসিয়েছে। বাল্মীকির মহাকাব্যে রৌদ্ররসের পাশে যে করুণরসের ধারা সংলগ্ন ছিল কৃত্তিবাস তাকে উদ্বেলিত করে তুলেছেন। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি রামমাহাত্মের ভক্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন : ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী।

জনপ্রিয়তার পঞ্চম কারণ বাক্‌ভঙ্গীর, অলংকার প্রয়োগের অকৃত্রিমতা। সংস্কৃত-পণ্ডিত কৃত্তিবাস কৃত্রিম কাব্যকলার দক্ষতা দেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা সংবরণ করেছেন।

তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥

সহজ বাক্‌প্রতিমায় প্রত্যক্ষ চিত্র সৃষ্টির একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই ছত্র দুটি। 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'—কিন্তু কৃত্তিবাস এমন সহজ কথার কবি। সহজ কথার খাতে বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনরসকে কৃত্তিবাস সেই যে পাঁচশ বছর পূর্বে বাহিত করে দিয়েছেন, আজও "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিছে পান।"

❋

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

"গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়।।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাথ।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।"

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত]

মালাধর বসুর পরিচয় ॥

বর্ধমান জেলার মেমারি রেলস্টেশনের কাছে কুলীনগ্রামে এক উচ্চ কায়স্থ বংশে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবির জন্মসন, জন্ম তারিখ পণ্ডিতগণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারেন নি। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে ১৪২০-২২ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কুলীনগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এই গ্রাম পরিচিত। মালাধর বসু গ্রামের এই ঐতিহ্যের মধ্যে বর্ধিত হয়ে পরিণত বয়সে স্বীয় প্রতিভায় এই ঐতিহ্যকেই বহুগুণিত করেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব মালাধর বসুর জন্মস্থান এই গ্রামকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর প্রতিভার সর্বাধিক স্বীকৃতি চৈতন্যদেব দিয়েছেন।

চৈতন্যদেব লক্ষ্য করেছিলেন, প্রেমরূপে কৃষ্ণকে ভজনা করবার রীতিটি মালাধর বসুই এদেশে প্রথম উল্লেখ করেন। এই রীতিই চৈতন্যদেবের লীলারীতি, সাধনরীতি। মালাধর বসু তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি গৌড়েশ্বরের কাছে পান। ভাগবত অনুবাদের জন্য কোনো এক গৌড়েশ্বর (পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্ অথবা তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্) তাঁকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাব্যপরিচয় ও কবিপ্রতিভা ॥

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'ই বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগবত রচনা। এ কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করে পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩

খৃষ্টাব্দে) এ কাব্যের রচনা শুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০) রচনা শেষ হয়। মধ্যযুগের বহু কাব্যের মতো শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও একাধিক ভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন— গোবিন্দবিজয়, গোবিন্দমঙ্গল। এ কাব্যের অবলম্বন সংস্কৃত ভাগবত,—ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্দের ঘটনা। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী ভাগবতের অনুবাদ নয়। দশম-একাদশ স্কন্দের কাহিনী অনুসরণ করে কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বাংলা ভাগবত রচনা করেন। বৃন্দাবনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বাঙালীর গৃহদ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেছেন। তিন খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য বিভক্ত। ১। আদ্যকাহিনী বা বৃন্দাবনলীলা, ২। মধ্য কাহিনী বা মথুরালীলা, ৩। অন্ত্য-কাহিনী বা দ্বারকালীলা। তিনখণ্ডে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। তিনখণ্ডের কাহিনীতে তিনি ভাগবতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ভাগবতের রচনায় কবির লক্ষ্য ছিল, ভাগবত যেন বাংলার লোককল্যাণ সাধন করে।

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাচালী-রচিয়া॥"

কাব্যের উপযোগিতা স্মরণে রেখে তিনি ব্যাপক অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকের জন্য তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে মূল ভাগবতের জটিল ধর্মতত্ত্ব বর্জন করেছেন।

বাঙালী করুণরসের ভক্ত, করুণরস সৃষ্টিতে বাঙালী কবি বড়োই দক্ষতা দেখান। মালাধর বসুও করুণরস সৃষ্টিতে নিপুণতা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণবিরহকাতর গোপীদের বিলাপ রচনায় পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিদের দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন। বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায়ও কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগে কবির নৈপুণ্য রসিকজনস্বীকৃত। ভক্ত কবি যদি প্রাজ্ঞপণ্ডিত হন তাহলে সংহত ভক্তির যে প্রদীপ জ্বালানো যায়, মালাধর বসু সেই প্রদীপটি বাংলাভূমিতে জালিয়ে রেখেছেন। সেই প্রদীপালোকে চৈতন্যযুগের ইঙ্গিত ছিল। ভাগবতভক্তির এই অকম্পিত শিখার আলোক দেখে চৈতন্যদেব আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনুরাগমূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তির জন্য মালাধর বসুর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।—মালাধর বসুর কাব্যের ও কবিকৃতির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেছেন স্বয়ং চৈতন্যদেব।

*

মঙ্গলকাব্য

যে সময় এই সব মঙ্গলকাব্য কাহিনী গড়িয়া উঠিতেছিল সে সময় ছিল স্বৈরাচারী রাজাদের কাল—তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী অনিশ্চয়তার কাল। প্রজাদের কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে তাহা ঠিক নাই। মানুষের চক্ষে তাই দেবদেবীকেও মনে হইয়াছে স্বৈরাচারী—কখন সর্বনাশ করিবেন, কখন ধনে ভরিয়া দিবেন—কিছুই ঠিক নাই। আত্মসমর্পণে লাভ, আত্মবিশ্বাসে ভরসা নাই।

—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—গোপাল হালদার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি মঙ্গলকাব্য। দেবদেবীদের পূজা প্রচার ও মহিমাবিষয়ক দীর্ঘবিস্তারী আখ্যানকাব্যই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেবদেবীই বাংলা গ্রামসমাজে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত। বাংলার প্রধান মঙ্গলকাব্য হলো মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এছাড়াও অন্নদামঙ্গল, শিবায়ন, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য নামকরণ নিয়ে নানাজনের নানা মত। কেউ বলেন এ কাব্য রচনা করলে, শ্রবণ করলে, গান করলে মঙ্গল হয়, তাই মঙ্গলকাব্য নামকরণ। আবার কেউ বলেন এক মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আরেক মঙ্গলবারে শেষ করা হোত বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ ॥

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ দু'ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে সমাজ ও সংসার জীবনের আধিভৌতিক আপদ-বিপদের ভয়ভীতি। অরণ্য, জলাভূমি অধ্যুষিত বাংলার আদি মানবসমাজ ছিল প্রতিপদে বিপন্ন। ঝড়, ঝঞ্ঝায় নিশ্চিহ্ন হয় সাধের সংসার। বাঘ, সাপ ইত্যাদি হিংস্র শ্বাপদের মুখে মানুষ অসহায়। রোগ শোক মহামারীর অনিবার্য উপদ্রবের নিকট তারা আত্মরক্ষায়

অপারগ। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কল্পনা করেছে মহাশক্তিধর কোনো অদৃশ্য দেবতার, যে দেবতা এই দুর্যোগ দুর্বিপাকনিয়ন্তা, যে দেবতার হাতে আছে এর থেকে ত্রাণের উপায়। এইভাবে চণ্ডী, দক্ষিণরায়, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবীর জন্ম হলো। ছড়ায়, পাঁচালীতে, মেয়েলী ব্রতকথায় এইসব দেবী তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। মধ্যযুগে, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতকে লোকমুখে প্রচারিত এই মঙ্গলগাথাকে শিক্ষিত কবিকুল পুনর্বিন্যাস করলেন। এই পুনর্বিন্যাসের তাগিদ তাঁরা বোধ করলেন এক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে—সেটাই মঙ্গলকাব্য রচনার দ্বিতীয় সামাজিক কারণ। এই বিপর্যয় ঘটল বাংলায় তুর্কী আক্রমণে। তুর্কী শাসকের স্বৈরাচারী চণ্ডরূপে বাংলার জনসমাজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তারা আত্মশক্তিতে আস্থাহীন, স্বধর্ম রক্ষায় অপারগ। এক পলায়নী মনোভাবে তারা জারিত হয়ে পড়েছিল। তুর্কী, পাঠান, মোঘল—রাষ্ট্রীয় এই উত্থানপতনের মধ্যে কখনও কখনও সুস্থিরতা দেখা দিলেও তাদের ভীতি, অস্থিরতা নির্মূল হয়ে গেল না। রাজশক্তির হাতে তারা ধনে-প্রাণে-ধর্মে কোনো ক্ষেত্রেই সুরক্ষার নিশ্চয়তা পেল না। আত্মবিশ্বাসহীন বিপন্ন মানুষ তখন আত্মরক্ষায় দেবদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। এই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে বাঙালী সমাজের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের দীর্ঘকালের বর্ণবিন্যাসেও এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে উচ্চবর্ণ আপন বর্ণাভিমানকে সঙ্কুচিত করল। বরাভয়ের প্রত্যাশায় তারা নিজেদের সমাজের আর্যদেবদেবীর বাইরে অনভিজাত সাধারণ মানুষের অনার্য লৌকিক দেবদেবীর শরণ নিল। মানসিকতার এই পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দুর দেবদেবীর আসনও টলে উঠল। মানুষের মতো দেবতাদের মধ্যে নৈকট্য সূচিত হল। দেবদেবীর বিশ্বাসে সূচিত হল একটা সমন্বয়ের যুগ। অনার্য চণ্ডী শিবঘরণী পার্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। ভয়ঙ্করী মনসা পরিচিতা হলেন শিবতনয়ারূপে। অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুর হলেন আর্যদেবতা বিষ্ণু। এইভাবে আত্মসমর্পণের ফলে দেবস্থান সমন্বয়ের পীঠস্থান হয়ে উঠল। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ একসঙ্গে মনে করল অতিমানবিক শক্তিধর এই দেববর্গ পরিতুষ্ট হলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। আবার তাদের কোপানলে অতিপরাক্রমশালী মানুষও ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হতে পারে। এই দেববিশ্বাসকে আশ্রয় করে শিক্ষিত কবিকুল লোক-প্রচারিত মঙ্গলগাথাগুলোর পুনর্বিন্যাস করলেন মঙ্গলকাব্যে। বাংলার মঙ্গলকাব্য বাঙালীর সমকালীন সমাজবোধে

দীপ্ত সাহিত্যচিন্তার এক অনন্য অবদান।

মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন ॥

মঙ্গলকাব্যের শিকড় সমাজের গভীরে নিবিষ্ট ছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তৎকালীন সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন গভীর মমতায়, আন্তরিক সততায়। এ-সব কাব্যের দৈব অঞ্চলখানা অণাবৃত করলে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে সমসাময়িক রাজনীতির উত্থানপতন, ধর্মের কোলাহল, অস্থিরতা, গৃহজীবনের আচার-আচরণ সুখদুঃখের নানাদিক। বস্তুত মঙ্গলসাহিত্য সমকালীন সমাজ ইতিহাসের এক বিশ্বস্ত আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে মধ্যযুগের নির্ভরযোগ্য কোষগ্রন্থ বলা হয়। মধ্যযুগের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ চিত্র রয়েছে এ কাব্যে। বনের সাধারণ পশুদের ওপর ব্যাধ কালকেতুর অত্যাচার রাজশক্তির অত্যাচারের প্রতীক। দেবী চণ্ডীর কাছে পশুদের ক্রন্দন অংশে রূপক মাধ্যমে কবি স্বৈরশাসন পীড়িত সাধারণ মানুষের দুরবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। কবির আত্মপরিচয় অংশে মধ্যযুগের সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ও রাজশক্তির অত্যাচারের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গলের রাঢ় দেশের সমাজ ও ইতিহাসের কিছু কিছু পরিচয়ের সঙ্গে রাজায় রাজায় যুদ্ধের সেকালের পরিচয় রয়েছে। মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিক দৈন্য-দারিদ্র্য, হীনমন্যতায় সঙ্কুচিত তৎকালীন বাঙালী সমাজের আত্মবীর্যে দাঁড়াবার অন্তর্লীন বাসনার সোচ্চার প্রকাশ। ধর্মমঙ্গলকাব্যে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র রয়েছে। লাউসেন ও কালুডোমের বীরত্ব অবহেলিত নিম্নবর্ণের জনসামাজের প্রতিবাদের প্রতীক।

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিচয়ের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যগুলিতে রয়েছে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিরোধ প্রস্ফুটিত। রায়মহলে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষের কিছু পরিচয় রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তৎকালীন সমাজ। সামন্ত আধিপত্য যেমন ছিল তেমনি ছিল শক্তিমান বণিকগোষ্ঠীর আধিপত্য। কর্নসেন (ধর্মমঙ্গল), ধনপতি সদাগর (চণ্ডীমঙ্গল) চাঁদসদাগর (মনসামঙ্গল) প্রমুখ প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারই সঙ্গে

পশুশিকারী ব্যাধসমাজ (কালকেতু, চণ্ডীমঙ্গল), হরিমোড়ের মতো দরিদ্র সাধারণ মানুষও (অন্নদামঙ্গল) সমাজের বৃহৎ জনসমষ্টি রচনা কয়রছিল। শ্রেণীগত বিরোধ, সমাজগত বিরোধ, আবার উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিরোধ নানান মঙ্গলকাব্যে রয়েছে। অবস্থাপন্ন ঘরের বাসরের বর্ণনা আছে, বিবাহের বর্ণনা আছে, সপত্নী সমস্যার জ্বালা-যাতনার চিত্র আছে মঙ্গলকাব্যে। তারই পাশে রয়েছে দরিদ্র মানুষের সংসারের বাস্তব চিত্র। কৃষক শিবের কাহিনী সম্বলিত শিবায়ণে রয়েছে শিব পার্বতীর ঘর গৃহস্থালীর বর্ণনা। বাংলার দরিদ্র কৃষক সমাজের গৃহস্থালীই শিব পার্বতীর গৃহজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে সুখী দম্পতির সুখচ্ছবির পাশাপাশি আছে অসচ্ছল সংসারের করুণ বারবাইস্থা। আছে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, বীরের বীরত্ব, খলের নীচাশয়তা। বেহুলার পাতিব্রত্যের মর্মন্তুদ বিবরণে মনসামঙ্গল করুণ, লহনাখুল্লনার সপত্নীবিরোধে চণ্ডীমঙ্গল বাস্তব। মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় দুঃসাহসী বাঙালীর বাণিজ্য উদ্যোগের পরিচয় ; অর্থনীতির এক নতুন দিক। সেদিনের বাঙালী সমাজের আহারবিহার হাসিঠাট্টা রসালাপ পোষাকপরিচ্ছদ, অলংকার, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায়।

মঙ্গলকাব্যে সর্বোপরি রয়েছে বাঙালীর দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয়। চাঁদসদাগরের অপরাজেয় পৌরুষ, বীর কালকেতুর নতুন নগর পত্তনের উদ্যোগ, লাউসেন, কালুডোম লখাডোমের বীরত্ব মধ্যযুগের বাংলার শক্তি শৌর্যের তথ্যচিত্র। অন্নদামঙ্গলে প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যযুগ অতিক্রমের মানসিক আকাঙ্ক্ষার চিত্র। এতকাল মানুষ ছিল দেবতার অধীন। অন্নদামঙ্গলের হরিহোড় দেবতাকে মানুষের অধীন করার সাহসী চেষ্টা করেছে, দেবী অন্নদাকে একের পর এক শর্ত দিয়ে গৃহবন্দিনী করেছে। অন্নদামঙ্গলে আধুনিকতার পদধ্বনি শোনা গিয়েছে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস যারা রচনা করবেন তাঁদের কাছে বিশ্বস্ত তথ্য-উৎস হবে এই মঙ্গলকাব্যগুলি ;

❋

মনসামঙ্গল

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, এমনকি উনবিংশ শতকেও মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, বাসুলী প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাহিনী অবলম্বন করে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে স্ত্রী দেবতার মহিমাবিষয়ক মঙ্গলকাব্যের সংখ্যাই বেশি। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, কাহিনী, চরিত্র-বিন্যাস, রচনাকাল বিচার করে মনসামঙ্গলের কাহিনী ও দেবীকে সর্বপ্রাচীন বলে অনুমান করেছেন। বাংলাদেশে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপলাই এই শতকের শক্তিশালী কবি। কারও মতে কাণা হরিদত্ত এই ধারার আদি কবি।

কাহিনী ॥

শিবের দৃষ্টি-বাসনা থেকে কন্যা মনসার জন্ম। মনসা প্রতিপালিত হন পাতালপুরীতে নাগকুলে নাগিনী কন্যারূপে। শিবঘরণী বিমাতা চণ্ডী এই অবাঞ্ছিত শিবতনয়াকে একদিন প্রহার করলেন। তাতে মনসা একটি চোখ হারালেন—তাঁর অপর নাম হল কানী। মনসা পিতা কর্তৃক দ্বিতীয়বার পরিত্যক্তা হলেন সিজুয়া পর্বতে। কন্যার দুঃখে শিবনেত্র থেকে নির্গত হল এক ফোঁটা অশ্রু। জন্ম নিলেন আরেক কন্যা নেত্রবতী বা নেতা। মনসা নেতাকে পেলেন সখী ও পরিচারিকারূপে। অতঃপর জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ হল মনসার। গর্ভবতী মনসা স্বামী কর্তৃক তৃতীয়বার পরিত্যক্তা হলেন। নেতার উপদেশে মনসা মনোবেদনা প্রশমনের জন্য মর্ত্যলোকে আপন পূজা প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হলেন। প্রথমে এক রাখালদলকে বিপদে ফেলে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করে ধনসম্পদে সুখী করে নিজের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। তারপর নির্বাচিত করলেন চম্পকনগরের বণিক-শ্রেষ্ঠ চাঁদসদাগরকে। শিবভক্ত মহাজ্ঞান প্রাপ্ত চাঁদসদাগর সর্পকুলের মহাশত্রু। সহচরী নেতার চক্রান্তে চাঁদের অন্তঃপুরে বণিকগৃহিণী সনকা গোপনে মনসার পূজা করতে

লাগলেন। একদিন এই সংবাদ সদাগরের গোচরে এলে তিনি হেঁতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। নিষিদ্ধ করলেন মনসার পূজার্চনা। অপমানিতা ক্রুদ্ধা মনসা প্রতিহিংসা গ্রহণে তৎপর হলেন। প্রথমে মহাজ্ঞান হরণ করলেন, সর্পবাহিনী পাঠিয়ে চাঁদের প্রাসাদ-উদ্যান বিনষ্ট করলেন, অনন্তনাগ ও বাসুকী নাগকে দিয়ে তার ছয় পুত্রকে নিহত করলেন। তারপর তার বাণিজ্য তরী সপ্তডিঙা মধুকর কালীদহে নিমজ্জিত করলেন। তবু অনমনীয় চাঁদ। মনসা নিজ পূজা করার প্রস্তাব পাঠালেন, চাঁদ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে শাপগ্রস্ত ঊষা ও অনিরুদ্ধ মর্তে অবতীর্ণ হলেন যথাক্রমে উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা ও চাঁদপুত্র লখীন্দর হয়ে। উভয়ের বিবাহ হলো। বিবাহের বাসর রচিত হল লৌহগৃহে। হেঁতালের লাঠি নিয়ে প্রহরায় রত হলেন সদাগর নিজে। সমস্ত সতর্কতা ও সাবধানতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মনসা প্রেরিত কালীয় নাগের দংশনে মৃত্যু হলো লখীন্দরের। লখীন্দরকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো কলার মান্দাস ভেলায়। বেহুলা সঙ্গে চললেন স্বামীর প্রাণ পুনরুজ্জীবনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বহু সময়, বহু নদীপথ অতিক্রম করে বেহুলা যখন স্বর্গে এসে পৌছলেন তখন তাঁর সঙ্গে আছে লখীন্দরের দেহাবশেষ কয়েকখানি অস্থিমাত্র। বেহুলা নৃত্যানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট করলেন দেবতাদের। দেবতারা বর দিতে চাইলে বেহুলা স্বামী-ভাসুরের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। একটি সর্তে তাঁরা প্রাণদানে স্বীকৃত হলেন—মর্তে ফিরে গিয়ে বেহুলা চাঁদ সদাগরকে মনসা পূজায় সম্মত করাবেন। সর্ত মেনে নিলেন বেহুলা। পুনরুজ্জীবিত হলো লখীন্দর, ভেসে উঠল মধুকর। স্নেহাতুর চাঁদ বেহুলার অনুরোধে বাঁ হাতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মনসার পায়ে অর্পণ করলেন সামান্য পুষ্পার্ঘ্য। মনসা সানন্দে তাই গ্রহণ করলেন। শাপমুক্ত ঊষা ও অনিরুদ্ধ স্বর্গে ফিরে গেলেন। মর্ত্যে প্রবর্তিত হলো মনসা পূজা।

॥ মনসামঙ্গলের প্রধান কবিবৃন্দ ও তাঁদের কাব্য ॥

ক. বিজয় গুপ্ত ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। 'পদ্মাপুরাণ' নামে মনসামঙ্গল কাব্য তিনি

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রচনা করেন। সেই গ্রন্থই তাকে যুগজয়ী খ্যাতির আসন এনে দিয়েছে। তাঁর সযত্নরচিত এই কাব্য ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও উল্লেখযোগ্য। সমকালীন সমাজ ও মানুষের জীবন ও চিন্তার অনেক সার্থক উল্লেখে বিজয় গুপ্তের কাব্য তথ্যসমৃদ্ধ। বরিশাল থেকে বাংলা ১৩০৩ সালে সর্বপ্রথম বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

তাঁর সৃষ্টি চাঁদ সদাগর অপরাজেয় পৌরুষসম্পন্ন। দৈন্য, দারিদ্র, হীনমন্যতায় সঙ্কুচিত তৎকালীন বাঙালীসমাজে চন্দ্রবণিক একটি যুগজয়ী ব্যতিক্রম। পরাভূত পশ্চাদপদ জনপদবাসীর অব্যক্ত ক্রোধ চাঁদের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা পেয়েছে। মনসাকে গ্রহণ না প্রত্যাখ্যান চাঁদের এই দ্বন্দ্ব বস্তুত অত্যাচারী শক্তিকে গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের দারুণ দ্বন্দ্ব। সেদিনকার সমগ্র সমাজজীবন এই দ্বন্দ্বেই বিদীর্ণ হচ্ছিল। বিজয় গুপ্তের শ্রেষ্ঠত্ব এই মানস দ্বন্দ্বের প্রতিভাস নির্মাণে। চন্দ্রধর শেষ পর্যন্ত মনসার পূজায় সম্মত হয়েছিলেন। সেটিই ছিল স্বাভাবিক। ঐক্য শক্তির অভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু তাতে যে তার অন্তরের সম্মতি নেই তার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট নিতান্ত অবহেলাভরে মনসার পূজায়।

যেই হাতে পূজি আমি শঙ্করভবানী।
সেই হাতে পূজা লইতে চাহ দুষ্ট কানী॥

বিজয় গুপ্ত বর্ণিত দেবচরিত্র অধিকাংশই দেবতার আদলে মানব চরিত্র। যেমন, দেবী মনসার আত্মবিলাপ,—

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥

মনসার এই আক্ষেপ কোন দেবচরিত্রের নয়। দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দুঃখিনী বঙ্গনারীর কণ্ঠই প্রতিধ্বনিত হয়েছে মনসার বিলাপধ্বনিতে। পিতামাতার স্নেহ, পতির প্রেম, সংসারজীবনের সুখসচ্ছলতা—পার্থিব কোন আনন্দই যার জীবনে অনুপস্থিত তার অন্তরভরা ক্ষোভ ও বিষবাষ্পই স্বাভাবিক। এই ক্ষোভ প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। বিজয় গুপ্তের শিব একজন শিথিল চরিত্র গ্রামীণ বাঙালীর

প্রতিচ্ছবি। অভাবে-অশান্তিতে দিশেহারা এক মানুষ যেন জীবনযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করেছে নিয়ত। বেহুলার চরিত্র পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করার প্রবল শক্তি ক্রমে তাঁকে উজ্জ্বল ও উন্নত মানবমহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সনকার চরিত্রে ব্যথাতুর মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার চিত্রিত হয়েছে। হাস্য ও কৌতুকরসের পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত বিজয়গুপ্ত সাধারণ চরিত্রকেও উপভোগ্য করে তুলেছেন।

সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
দারুণ জর পাইলে গোদা ছাড়ে ভাতপানি॥

কথনো কথনো এরূপ চটুল কৌতুক স্থূল, অশালীন মনে হতে পারে। কিন্তু কবি নিটোল গ্রামীণ জনজীবনকেই চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে পরিশীলিত রুচি অপেক্ষা স্থূলতাই স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কণের প্রতি, উপজীব্য চরিত্রে মৌলিকতার প্রতি কবি সজাগ। নাগরিক পরিশীলনের প্রলেপে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ভদ্র হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্য নিখাদ সমাজ চিত্র।

খ. নারায়ণ দেব ॥

নারায়ণ দেব পরিণত প্রতিভার কবি। তাঁর প্রতিভা বাংলা ছাড়িয়ে আসামের দূর প্রান্তেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। অসমীয়া ভাষায় লিখিত তাঁর পদ্মাপুরাণ পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নারায়ণ দেব বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের বোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরা ভণিতা সুকবিবল্লভ নারায়ন দেব। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দেবখণ্ডের কাহিনী গৃহীত হয়েছে মহাভারত, শৈবপুরাণ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি থেকে।

নারায়ণদেবের সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে চাঁদ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে চাঁদ চরিত্র পৌরুষে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজয় গুপ্তের চেয়ে নারায়ণদেবের চাঁদের কণ্ঠস্বর বেশী দৃপ্ত,

"কি করিবে পুত্রে মোর কি করিবে ধনে।
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে॥"

মনুষ্যত্বকে, পৌরুষকে নারায়ণদেবের চাঁদ সম্পদ ও প্রিয়জনের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। করুণরস সৃষ্টিতেও নারায়ণদেব অতুলনীয়। তাঁর নারীচরিত্ররা কোমলস্বভাবা অশ্রুবর্ষণপ্রিয় বাঙালী নারীর মত যে কোনো সুযোগে হৃদয়ের আর্তিকে সশব্দে ও সক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন। কারুণ্য প্রকাশ থেকে তাঁর লখীন্দরও বাদ পড়েনি।

ওঠলো সুন্দরী বেউলা কত নিদ্রা যাও।
কালনাগ খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতি তলে।
অকালেতে রাড়ি হলা খণ্ডব্রত ফলে॥

নারায়ণদেব গ্রামবাংলার ঘনিষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নানা অধ্যায়ে আছে বাঙালীর পরিচিত খাদ্য তালিকা : শাক ভাজা ডাইল মাছ মাংস পিঠা ; সর্পকুলের বিবরণ : বাসুকী তক্ষক অনন্ত লোন্ধা ঢেমসা কেউটিয়া শঙ্খিনী ; নদীর নাম : গঙ্গা আত্রাই সুরভি ভাগীরথী সুবর্ণরেখা মন্দাকিনী ফল্গু বৈতরণী। লোকজীবন হাসি-কান্না দুঃখ বেদনার যে ছন্দে প্রবাহিত হয় নারায়ণদেব সেই ছন্দকেই ধরেছেন তাঁর কাব্যে। তাঁর অন্তরঙ্গ কবিদৃষ্টি ঘরোয়া জীবনের অনেক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। বেহুলার বিবাহ দৃশ্যে রন্ধন উপচার তার চমৎকার নিদর্শন। রন্ধনরত রমণীর কর্ণাভরণের দোদুল্যমানতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। 'রন্ধন রাঁধে তারকা কানে লড়ে সোনা'। তাঁর মনসা মানবিক আকাজ্ক্ষার প্রতিমূর্তি। স্বামীকে পুনরু-জ্জীবিত করার সংকল্পে দুর্দম বেহুলাকে সহস্র বিপদেও অবিচল দেখা যায়। আবার স্বামীর মৃত্যুদৃশ্যে তাঁর মর্মন্তুদ হাহাকার পাঠককে অভিভূত করে দেয়। সুকবিবল্লভ নারায়ণদেব প্রকাশভঙ্গি ও চরিত্র সৃজনের ক্ষমতায় একজন নিপুণ কবি হিসাবে চিরকাল সমাদৃত হবেন।

গ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ॥

শপ্তদশ শতকে মনসামঙ্গলের শক্তিশালী কবি যেমন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, সপ্তদশ শতকের শক্তিশালী কবি ক্ষেমানন্দ। ক্ষেমানন্দ চৈতন্য প্রভাবিত যুগের কবি। তাঁর ভাষা, ভাবাদর্শে এই প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। 'কেতকাদাস' কবির উপাধি। কবির কাব্যে

কোথাও রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এ শতকে বহু কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজবংশী দাস, জগজীবন ঘোষাল। যাই হোক, কেতকাদাসের কাব্যে পদলালিত্য ও ভাব-মাধুর্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে নি। নারী চরিত্র-চিত্রণে যে সুকোমল বিনম্রতা ফুটেছে তা বৈষ্ণবীয় বিনম্রতাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভক্তি-প্রাধান্যের ফলে তাঁর চাঁদ সদাগর পৌরুষহীন, দৃঢ়তাহীন, খর্বকায়।
সাংসারিক দুঃখশোকের অভিঘাতে বেহুলা-জননী 'অবলা' কিংবা লখীন্দর জননী-'সনকা' উভয়ের অন্তর বেদনাবিধুর। কাব্যের বহু অংশ তাঁদের কাতর উক্তিতে অভিষিক্ত।

ক্ষেমানন্দের সর্বাধিক সাফল্য বেহুলা চরিত্র পরিকল্পনায়। আশৈশব লাবণ্যময়ী বেহুলা কোমলতা ও লজ্জাশীলতায় আরো সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। সর্পাঘাতে মৃত পতিকে দেখে প্রথমবারের মত বেহুলা আর্তনাদ করে উঠেছে সিজুয়া পর্বতের নিশীথ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে। ক্রমে বেহুলার চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে দৃঢ়চিত্ততা, অবিচল একাগ্রতা। সনকার নিষেধ, ভ্রাতার কাতর অনুনয়, নগরের নরনারীর আকুল আবেদন—সবকিছুকে উপেক্ষা করে স্বর্গলোকের অজ্ঞাত পথে অগ্রসর হয়েছে বেহুলা। পথের দূরত্ব, পথচলার কল্পনাতীত বাধাবিঘ্ন কোন কিছুই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি।

যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিয়া কয়।
কেমনে ভাসিয়া যাবে মনে নাহ্নি ভয়॥
বেহুলার মন তাতে প্রবোধ না মানে।
নিমিষ মিলায় তার প্রভুর বদনে॥

বেহুলার এই অপরাজেয় মনোবল শেষ পর্যন্ত সাফল্য এনে দিয়েছিল। কেতকা-দাস ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান বাঙালীর রমণীয় অশ্রুসিক্ত আলেখ্য।

ক্ষেমানন্দের কাব্যের আরেক বৈশিষ্ট্য ভৌগোলিক তথ্য-অনুসরণ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথ বর্ণনায় বা বেহুলার যাত্রাপথের বর্ণনায় কবি ভৌগোলিক সংস্থান সমূহের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

নানাভাবে রূপায়িত হল। এই প্রত্যয়ে বাংলা সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে বিষয়ের ক্ষেত্রে যেন নতুনত্ব এল, শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কারেও পরিমার্জনা এল, প্রকাশ ক্ষমতা বর্ধিত হলো, লাবণ্য সঞ্চারিত হলো। সাহিত্যের রুচির ক্ষেত্রে সমুন্নতি ঘটল।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন পরিমাপ লাভ করল বৈষ্ণবপদাবলী। চৈতন্য পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদে ভক্তির কথা ছিল কিন্তু ভক্তির দর্শন ছিল না। চৈতন্যদেব ভক্তির মণ্ডে গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা সিঞ্চন করলেন, অধ্যাত্ম অনুভূতি সঞ্চারিত করলেন। চৈতন্য সমকালের ও পরবর্তী পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সাধনার তত্ত্বে ও অনুভূতিতে চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলী থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রমুখ এই স্বতন্ত্র ধারার পদস্রষ্টা। নতুন ভাবের সঙ্গে পদলালিত্যে, ছন্দকুশলতায়, ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্যে বাংলা পদসাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করল।

চৈতন্যদেবের জীবন বাংলা সাহিত্যে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে সম্পূর্ণ নতুন ভাবের ও বিষয়ের একগুচ্ছ পদ সৃষ্টি করে দিল। চৈতন্যদেবের প্রধান অবদান দেববাদ-নির্ভরতার মধ্যে মানবিক আবেগ সৃষ্টি। গৌরচন্দ্রিকায় সেই মানবাগ্রহ স্বীকৃত। চৈতন্যদেবের লীলাজীবন নিয়েই এইসব পদের বিন্যাস। রাধাকৃষ্ণের লীলাবৃন্দাবনে প্রবেশের চাবিকাঠি মানুষ-গৌরাঙ্গকে নিয়ে রচিত এই পদসমূহ।

চৈতন্যদেব বাংলার লোকজীবনকে প্লাবিত করেছিলেন। সে জীবনধারা মথিত হয়ে কীর্তনসুরে মুখরিত হয়ে উঠল। বাংলার কীর্তনে বাংলার প্রাণের ঠাকুর চৈতন্যদেব সর্বত্র অনুভূত হয়ে আছেন।

চৈতন্যদেব শাক্তপদাবলীকেও প্রভাবিত করেছেন। বৈষ্ণবগীতির অনুকরণে শাক্তগীতির উদ্ভব হল। রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের প্রতিভা ভিন্ন স্বাদে বাঙালীর রসচেতনাকে তৃপ্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার লোকজীবনে প্রাণপ্রিয় চৈতন্যদেবকে তাঁরা নিজের করে নিয়ে এই লোকায়ত ধারা আয়ত্ত করেছেন।

হেমকল্পতরু চৈতন্যদেবের হেমকান্তির ছটায় সুপ্রাচীন মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যের শাখায় ভাবের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এলো। মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামকে চৈতন্যপ্রেমধর্ম অনুপ্রাণিত করেছে। মানুষের প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থাকলেও মানুষকে ভালোবাসার আবেগ চৈতন্যদেব থেকে মুকুন্দরামে সঞ্চারিত হয়েছে। কালকেতুর গুজরাট নগরে যে সাম্প্রদায়িকতামুক্তির সুর ধ্বনিত

হয়েছে, তার মূলে রয়েছে হুশেনশাহের প্রভাব এবং সর্বাধিক চৈতন্যের প্রভাব। দ্বিজমাধবের সারদা-চরিত্রে চৈতন্যদেবের মানবাগ্রহেরই পরিচয়। দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে চৈতন্যদেবের মানবতা বোধের প্রভাব স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী-লাউসেন, মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর-বেহুলা, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ফুল্লরা চরিত্রে মানবিক আবেদন যে সমধিক তার প্রেরণাস্থল চৈতন্যদেবের 'নরলীলা'।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনুবাদ সাহিত্যকেও চৈতন্যপ্রেমধর্ম প্রভাবিত করেছে। আর্য সংস্কৃতির রামচন্দ্র ও কৃষ্ণার্জ্জুন চৈতন্যদেবের প্রেম ও মাধুর্য রসে মণ্ডিত হলেন। চৈতন্য জীবনলীলা বাংলা সাহিত্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের মতো জীবনী সাহিত্য নামে এক নব সাহিত্য ধারা সৃষ্টি করে দিল। চৈতন্যদেব নরচন্দ্রমা—কিন্তু তাঁর অবতারতত্ত্বের চন্দ্রিমা তাঁর মধ্যে যতই থাক তাঁর এই নতুন ভাবের নরের স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যকে আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের মানবাগ্রহে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। নরের স্বীকৃতি নিয়েই জীবনীসাহিত্য ইতিহাসের উপাদানে ও ভক্তির উপকরণে এক নবধারায় গড়ে উঠল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত এই নবধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। চৈতন্য জীবন ও সমসাময়িক যুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান উপাদান এই জীবনী সাহিত্য বহন করছে।

পূর্ববঙ্গগীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকায়ও চৈতন্যদেবের নতুন ভাবের প্রভাব পড়েছে। গীতিকার ভাবগৌরব হলো মানবিকতা এবং তা চৈতন্যদেবেরই অবদান।

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে চৈতন্যদেবের সার্বজনীন প্রেম-ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। যবন হরিদাসকে চৈতন্যদেব যে কোল দিয়েছিলেন তাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের সুর বেজে ছিল। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবপদ রচনায় সেই সুরেরই সুস্থ সাহিত্যিক প্রকাশ।

চৈতন্যদেব যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করলেন তা ভারতীয় দর্শনচিন্তার ধারায় এক মূল্যবান সম্পদ। চৈতন্যদেবের জীবন ও চিন্তা-আচরণের এক মহাসামগ্রী এই দর্শন। প্রত্যক্ষভাবে পদ-সাহিত্যে এই দর্শনের প্রভাব যেমন অসাধারণ, পরোক্ষভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যভূমির প্রতিটি ধারায় এই দর্শনই প্রভাব বিস্তার করেছে।

সমাজজীবনে ও সাহিত্যে চৈতন্যদেব

"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।,'
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধ্যযুগের বাংলার এক অমিতশক্তিধর ব্যক্তিত্ব চৈতন্যদেব। এই শক্তি একটা জাতির আশা-ভরসার নির্ভয় আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবার শক্তি ; একটা জাতির সাহিত্য সংস্কৃতিকে নতুন ভাবধারার প্লাবনে সমুন্নত করার শক্তি। বাংলা সাহিত্যের একটা শতাব্দীকেই (ষোড়শ শতককে) চৈতন্যযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ কেউ এই যুগকে চৈতন্য নবজাগরণ বা চৈতন্য রেণেশাঁসের যুগ বলতে চেয়েছেন। তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন চৈতন্যদেব তাঁর নবজীবনের বাণীতে মধ্যযুগের বাংলাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

নবদ্বীপে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে (৮৯২ বঙ্গাব্দে) ২৩শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় শুক্রবার (বা শনিবার) চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের সাত বছর পরে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুশেন শাহ বাংলায় হুশেনশাহী সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। হুসেনশাহী আমলেই (১৪৯৩—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ) চৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠার বিস্তার। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজকের বেশে পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার নীলাচলে (পুরী) আসেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেই আষাঢ় মাসে তাঁর তিরোধান ঘটে।

বাংলার সমাজজীবনে চৈতন্যদেব ॥

তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্যযুগের বঙ্গভূমির ঐতিহাসিক প্রয়োজনে চৈতন্যদেবের জন্ম। তুর্কী বিজয়ে বাংলার মোহনিদ্রাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের ভাঙন তীব্র হয়ে ওঠে। একেই জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, আচার-বিচার সর্বস্বতা, শাস্ত্রীয় আড়ম্বর, ভোগসুখ-মত্ততা বাংলার সমাজকে সহস্র শৈবালদামে জড়িয়ে তার বিকাশ রুদ্ধ করেছিল,

তার ওপর মুসলমান শাসনের প্রথমদিকের চণ্ডরূপ এবং অবক্ষয় সমাজকে নীরক্ত পাণ্ডুর করে তুলেছিল। স্বধর্ম, স্বদেশ থেকে পলায়নপরতা দেখা দিল। সমাজের এক সার্বিক অধোগতি ঘটল। হুসেন শাহের রাজত্বে সুলতানের পরধর্ম-সহিষ্ণুতায়, রাজকার্যে অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধির ফলে সমাজে কিছুটা সুস্থিরতা ফিরে এলেও, সম্পূর্ণ আস্থা ফিরে আসেনি। আস্থাহীন, ভীতসন্ত্রস্ত, অধঃপতিত সমাজে মানুষ আশা-ভরসার আশ্রয় খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছে। সমাজের এই আশ্রয়-লাভাকাঙ্ক্ষার থর থর বুকে চৈতন্যদেব 'নতুন ভাবের' এক ভূখণ্ডে জাগ্রত হলেন। এই ভাব প্রেমধর্মের ভাব। মধ্যযুগের দেববাদ নির্ভরতার মধ্যে মানবিক আবেদন জাগ্রত করে দিয়েছে এই নবীন ভাব। 'নরলীলা' শ্রেষ্ঠ লীলা—মানব মহিমার এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিলেন চৈতন্যদেব। এই ভাব উন্নত রুচির ভাব, সর্বজনীন প্রেম-ঐতিহ্যের ভাব। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের নাগপাশ থেকে, জাতপাত, বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার আত্মহনন থেকে জাতিকে অনেকাংশে মুক্তি দিল এই নতুন প্রেমধর্ম। দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির পথ তৈরি হল। অবৈষ্ণব হিন্দু সমাজের প্রবল বাধার মুখে দাঁড়িয়ে কাজীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেব এই নতুন ভাব প্রচার করতে লাগলেন। যবন হরিদাসকে তিনি কোল দিলেন ; ঘোষণা করলেন কৃষ্ণপ্রেমধর্মে মানুষে মানুষে ভেদ নেই—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপয়ায়ণঃ"—হরিভক্তিপরায়ণ অপাংক্তেয় ব্যক্তিও ব্রাহ্মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ঘোষণায় পলায়ণপর মানুষ থমকে দাঁড়াল, আস্থাহীন সমাজ নবপ্রত্যয়ের আশাবাণী শুনে ভরসা পেল। ভীত, উপদ্রুত মানুষের মনে চৈতন্যদেব নির্ভরতা সঞ্চারিত করলেন। ক্লীব, ক্লিন্ন একটা সমাজ চৈতন্যদেবের সাহসের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে, লোকহিতৈষীর মধ্যে মনোবলে জাগ্রত হল। চৈতন্যদেব বাংলা সমাজে এক নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে দিলেন। সমাজে অবহেলিত অংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পেয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা পেল। ব্যাপক মানুষকে এইভাবে আকৃষ্ট করে এই নতুন ভাব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে এক কূলপ্লাবনী শক্তিতে পরিণত হলো। চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাংলার সেই অমিত শক্তিধর ব্যক্তিত্ব।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব ॥

বাংলা সমাজে চৈতন্যদেব যে নবপ্রত্যয় এনে দিলেন, বাংলা সাহিত্যে সেই প্রত্যয়

আধুনিক যুগেও সাহিত্য রচনায় চৈতন্যদেব অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র সেনের অমৃতাফকাব্য, শিশিরকুমার ঘোষের অমিয়নিমাইচরিত, গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা তারই প্রমাণ। সম্প্রতি চৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে গবেষণা গ্রন্থরচনা বাংলাসাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।

সাহিত্যের ইতিহাসে যুগনির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো এক ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এইরূপ এক ব্যক্তিত্ব। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া এইরূপ ব্যক্তিত্ব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এইরূপ ব্যক্তিত্ব ছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যযুগ, চৈতন্য পরবর্তী যুগ ইত্যাদি যুগ বিভাগ প্রমাণ করে বাংলা সাহিত্যকে চৈতন্যদেব কী বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছেন। আধুনিক যুগের যে অবিমিশ্র মানবতাবাদ তা চৈতন্যদেবে সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেববাদনির্ভর মানবতার স্তর অতিক্রম করেই অবিমিশ্র মানবতাবাদ সাহিত্যে এসেছে। চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যে সেই পূর্বস্তরের স্রষ্টা। বাংলা সাহিত্য চৈতন্যমূল্যায়ণ সমাপন না করে আধুনিক যুগে কখনই প্রবেশ করতে পারে না।

※

চণ্ডীমঙ্গল

মনসামঙ্গল যেমন প্রাক্ চৈতন্যযুগের কাব্যধারা, চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্যযুগের ধারা। ষোড়শ শতকেই কবিরা প্রথম চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে ব্রতকথার সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে আখ্যানকাব্যের রূপ দান করলেন। এই ধারার আদি কবি বলে যিনি পরিচিত তাঁর নাম মানিক দত্ত। স্বয়ং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানিক দত্তকে আদি কবির মর্যাদা দিয়েছেন। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বহু কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারায় কাব্য রচনা করেন, তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুকুন্দরাম দ্বিজমাধব, দ্বিজরাম দেব।

কাহিনী ॥

চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যান প্রধানতঃ দুইটি পর্বে বিন্যস্ত—নিষাধ কালকেতু উপাখ্যান, এবং সদাগর ধনপতি উপাখ্যান।

১. সহচরী পদ্মার মন্ত্রণায় শিবঘরণী পার্বতী মর্ত্যবাসীর পূজালাভে লোলুপ হলেন। তাঁর পূজা প্রচারের পটভূমি রচনার জন্য ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শাপগ্রস্ত হয়ে জন্ম নিলেন ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে। নীলাম্বর-পত্নী ছায়াও অনুরূপভাবে মর্তে এলেন ব্যাধকন্যা ফুল্লরা হয়ে। উভয়ে যথাকালে বিবাহসূত্রে যুক্ত হলেন। রূপবান পরাক্রমশালী ব্যাধ কালকেতুর দাম্পত্য-জীবন সচ্ছল না হলেও সুখী ছিল। স্বামীর শিকারলব্ধ পশুমাংস বিক্রি করে ফুল্লরা সংসার চালায়।

কালকেতুর ভয়ে সন্ত্রস্ত বনবাসী পশুর দল দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হল। তাদের প্রার্থনা দেবী যেন এই নিষ্ঠুর ব্যাধকে নিবৃত্ত করেন। দেবী মায়া-কুয়াসার সৃষ্টি করে সমস্ত পশুকে লুকিয়ে রাখলেন। নিজে এক স্বর্ণগোধিকায় রূপান্তরিত হয়ে পথে পড়ে রইলেন। শিকারে ব্যর্থ কালকেতু এই গোধিকাকেই ধরে নিয়ে এল ঘরে। স্বামী-স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গোধিকা (গোসাপ) রূপ বদল করে হয়ে গেল এক মোহময়ী

সুন্দরী রমণী। ফুল্লরা ফিরে এলে রমণী বললেন—তিনি গৃহত্যাগী, কালকেতু বন থেকে তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছেন। ঘরে ফিরে কালকেতু একথা শুনে হতবাক। প্রথমে রমণীকে স্বগৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে ক্রুদ্ধ ব্যাধ শরনিক্ষেপে উদ্যত হল। তখন চণ্ডী মহিষাসুরমর্দিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন ব্যাধ দম্পতির সম্মুখে। কালকেতু-ফুল্লরা প্রণত হল দেবীর চরণে। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী এবং সাত ঘরা ধন দিলেন।

কালকেতু দেবীর নির্দেশে নূতন নগর পত্তন করল গুজরাটে। নগর জনবহুল হল। বহু সজ্জন নাগরিকের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তকে দেখা গেল। কালকেতুর মন্ত্রী ভাঁড়ু দত্ত। তার ষড়যন্ত্রে কলিঙ্গরাজ কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলেন, তাকে পরাজিত ও বন্দী করলেন। কারাগারে বন্দী কালকেতু আরাধ্যা দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করল। তাঁর স্বপ্নাদেশে কালকেতু মুক্তিলাভ করল, ফিরে পেল হৃত রাজ্য। গুজরাটে কিছুকাল সগৌরবে রাজত্ব করে কালকেতু ফুল্লরা ফিরে গেল স্বর্গে। ইতিমধ্যে চণ্ডীপূজা প্রবর্তিত হয়ে গেছে মর্তে।

২. চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপাখ্যান বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতি সদাগরের। মর্তে পূজাপ্রবর্তনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সুরসভার নর্তকী রত্নমালা শাপগ্রস্তা হয়ে লক্ষপতি বণিকের ঘরে জন্ম নিলেন খুল্লনা নামে। উজানী নগরের বণিক ধনপতি সদাগর খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রথমা স্ত্রী লহনার সম্মতিতে খুল্লনাকে বিবাহ করলেন। রাজার আদেশে ধনপতিকে যেতে হল গৌররাজ্যে সোনার পিঞ্জর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। দুঃশীলা দাসী দুর্বলার ষড়যন্ত্রে খুল্লনার হাতে এল স্বামীর জাল চিঠি। চিঠির নির্দেশ —খুল্লনাকে অতঃপর ছাগল চরাতে হবে, বাস করতে হবে ঢেঁকিশালে এবং আহার করবে দিনে একবেলা। রানী খুল্লনা হয়ে গেল দাসী। চণ্ডীর কোপে একদিন তার ছাগ সর্বশী হারিয়ে গেল, আবার চণ্ডীর অনুগ্রহে সে ফিরে পেল সর্বশীকে। ধনপতি দেশে ফিরে সব বুঝতে পেরে খুল্লনাকে পূর্বমর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিবর্গ খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে খুল্লনা সতীত্বের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চণ্ডীর দয়ায়। স্বামীর কল্যাণে খুল্লনা গোপনে চণ্ডীর পূজা করছিলেন। শিবভক্ত ধনপতি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করল চণ্ডীর ঘটে।

ক্রুদ্ধা চণ্ডী ধনপতির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। সিংহলরাজকে কালীদহে কমলে-কামিনী দেখাতে না পেরে কারাগারে বন্দী হলেন ধনপতি। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত একই কারণে কারাবন্দী হল। চণ্ডীর অনুগ্রহে উভয়ে মুক্তিলাভ করল এবং সিংহল রাজাকে প্রতিশ্রুত কমলে-কামিনী প্রদর্শন করাল। শিবপূজারত ধনপতি একদিন দেখলেন ইষ্টদেব শিবের অর্ধাঙ্গ জুড়ে আছেন চণ্ডী। ধনপতি বুঝলেন—'একতনু মহেশ-পার্বতী।' তিনি চণ্ডীর পূজা করলেন। অতঃপর মর্তে চণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হল।

॥ চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবিবৃন্দ ও তাঁদের কাব্য ॥

ক. দ্বিজমাধব ॥

কাব্য রচনার কাল বিচারে দ্বিজমাধব মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি। দ্বিজমাধবের চণ্ডী-মঙ্গল ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। কবি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। পরে মোঘল-পাঠানের বিরোধের ফলে চট্টগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। দ্বিজমাধবের কাব্যের নাম সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত। দ্বিজমাধবের কাব্য বাস্তবানুসারী, সরল ও সাবলীল। চৈতন্যপ্রভাবে দ্বিজমাধবও মানবতাবাদে উদ্দীপ্ত। আশৈশব প্রকৃতির কোলে লালিত কালকেতুর জীবনকে কবি রূপায়িত করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে, সযত্নে।

বাটুল বাঁশ লয়ে করে   পশু পক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি   থাকয়ে মারয়ে পাখী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥

কালকেতুর শক্তিমত্তার এইরূপ বিশদ চিত্রের পাশাপাশি নির্জন অরণ্যপ্রান্তরে তার দারিদ্র্যজর্জর জীবনযাত্রার পরিচয়ও সুচিত্রিত। তাঁর অপরাপর চরিত্রগুলি বর্ণনার গুণে বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাঁর কালকেতু যেমন বীরত্বে মহান—'রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে', তাঁর ভাঁড়ুদত্ত তেমনি প্রবঞ্চনায় দক্ষ। তার 'স্বার্থপরতা, ছলনা ও প্রতারণা বিস্ময়কর। কবি কৌতুকের ভঙ্গিতে ভাঁড়ুদত্তকে চমৎকার করে উপস্থাপিত করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি তিনি সযত্নে গড়ে তুলেছেন। তাঁর দুর্বলা দাসী

যেন ভাঁড়ু দত্তের নারী সংস্করণ। দুই সতীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশে সে বলে :

ঋজুসতী ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সার্পিণী বাঘিণী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥

তার এই কুমন্ত্রণা লক্ষ্যভেদ করেছে।

দ্বিজমাধবের ধনপতি এবং শ্রীমন্ত চরিত্রও সুপরিকল্পিত। কমলে-কামিনী প্রদর্শনে ব্যর্থ ধনপতির দুর্দশার চিত্র, শ্রীমন্তের রূপ বর্ণনা কিম্বা পতিপুত্রের কল্যাণ কামনায় ভক্তিমতী খুল্লনার মমতাময়ী মূর্তি দ্বিজমাধবের বর্ণনায় সমুজ্জল। পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম অনেকাংশে দ্বিজমাধবের নিকট ঋণী॥

খ. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম॥

চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয়। কবির কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। কাব্যের প্রথমাংশে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তার থেকে কবির ব্যক্তিজীবন, তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। মোগল-পাঠানের ক্ষমতার লড়াইয়ের পটভূমিকায় কবির আবির্ভাব। কৃষির দ্বারা কবির সংসার নির্বাহ হত। ক্ষমতার লড়াইতে কবি কৃষিভিত্তিক পারিবারিক জীবন থেকে উচ্ছেদ হলেন এবং মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গেলেন। এই নিরাপদ আশ্রয়ে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে ও ছাত্র জমিদারপুত্র রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে কবি দুই খণ্ডে অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। লোক প্রচলিত কাহিনীকে কবি প্রধান অবলম্বন করলেন। কাহিনী রচনায় যতটা নৈপুণ্য কালকেতুর কাহিনীতে রয়েছে ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে তার অভাব।

মধ্যযুগের অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা-চরিত্রের ঘনঘটার মধ্যে মুকুন্দরামের কাব্য একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কাব্যের চরিত্রগুলিকে মানবমহিমায় মণ্ডিত করার দুর্লভ মানসিকতা ছিল মুকুন্দরামের। জনজীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সততা নিয়ে, উপলব্ধি করেছেন সহানুভূতি দিয়ে। মধ্যযুগে রাজশক্তির অত্যাচারে

অত্যাচারিত মানুষের ক্রন্দন এবং মুক্তির বাসনা তাঁর কাব্যে রূপক-এ, আত্ম-পরিচয়ের অশ্রুতে জীবন্ত ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। দেবী চণ্ডীর কাছে পশুদের বিলাপ অংশে রূপকের মাধ্যমে কবি স্বৈরশাসনে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন। হুক্ হুক্ করে কেঁদে কেঁদে বাঁদর আপন দুঃখ নিবেদন করছে, দুঃখ নিবেদন করছে ভালুক, "ভূমে গড়াগড়ি কান্দে শশারু সজারু।" কবির আত্ম-পরিচয় অংশে মধ্যযুগের সমাজজীবনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ও রাজশক্তির অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে অশেষ দুর্গতি ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন তিনি। জীবনের এইসব অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঘটনার বর্ণনায় এবং চরিত্রের চিত্রণে। এইজন্য মুকুন্দরাম জনজীবনের কবি। তাঁর কাব্য মধ্যযুগের বাংলার সমাজজীবনের বিশ্বস্ত কোষ-গ্রন্থ।

ধূর্ত চরিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরাম দক্ষ ছিলেন। মুরারী শীল, ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র বর্ণনা, দুর্বলা দাসীর চরিত্রাঙ্কণের স্বাভাবিকতা কবির বাস্তব দৃষ্টির, জনজীবনাভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

কালকেতুর রূপ বর্ণনায় মুকুন্দরাম বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবি যেন বাটালি হাতে নিয়ে কুঁদে কুঁদে কালকেতুকে অঙ্কন করেছেন। ভাবের সংযম ও বাক্ প্রতিমা সৃষ্টির দক্ষতা এখানে উল্লেখযোগ্য।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি
সবার লোচন সুখ হেতু ॥
....
দুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধানে রাঙা ধুতি মস্তকে জালের দড়ি
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥

ফুল্লরার বারমাস্যা সমকালীন বাংলার দুঃখদীর্ণ জীবনযাপনের দলিল : মুকুন্দরামের সহৃদয়তা ও সমাজ জীবন চারিতার নিদর্শন।

বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
……পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সব শরীর দহন॥
……অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটির পাথরা॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥

ফুল্লরার এই সংসার-বেদনার মধ্যে এদেশের একালের দারিদ্র্যপীড়িত ফুল্লরা-বধূরা তাদের হাহাকার শুনতে পাচ্ছে। দুঃখ বর্ণনার ভাষা এখানে লক্ষণীয়।

ধনপতি উপাখ্যানে মুকুন্দরাম দুঃখের কথায় মুখর। হাস্য পরিহাসে, সরস বাদানুবাদে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে; বর্ণনায় কবি-চাতুর্য রয়েছে। সপত্নী সমস্যায় পীড়িত খুল্লনার আর্তিতে, শ্মশানভূমিতে শ্রীমন্তের অসহায়তায় কবির আন্তরিক সহানুভূতি অনুরণিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় দৃষ্টির সীমবদ্ধতা থাকলেও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন মুকুন্দরাম। শাসকের নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে পীড়িত মানুষকে মুক্তিদানের সংকল্প উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কাল-কেতুর কণ্ঠে। ডিহিদারের অত্যাচারে পীড়িত বুলান মণ্ডলদের কালকেতু নতুন নগরপত্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছে—সে নগরে অত্যাচার থাকবে না, জাতিভেদ থাকবে না, খাজনার জন্য মানুষ উচ্ছেদ হবে না—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর   সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস   যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা   কারে না করিও শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
খন্দে নাহি দিব বাড়ী   রহে বসে দিও কড়ি
ড়িহিদার নাহি দিব দেশে।

সেলামী বাস গাড়ী নানাভাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে ॥

এই নতুন নগর অত্যাচারী ডিহিদারদের হাত থেকে সর্বকালের অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির নগর। এখানে সোনার কুণ্ডলের ঢল ঢল শান্তি। এই শান্তি সন্ধানেই মুকুন্দরাম বাস্তবরসের স্রষ্টা। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের জীবনমুখী শ্রেষ্ঠ কাব্য। মুকুন্দরাম বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবী ঐতিহ্য।
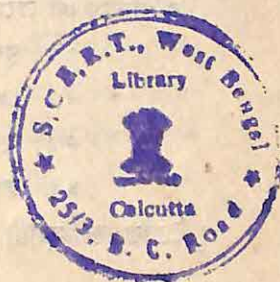
চৈতন্যজীবনী সাহিত্য

"শ্রীচৈতন্যের জীবনাশ্রয়ে গঠিত বৈষ্ণবজীবনী-সাহিত্য সর্বপ্রথম সমাজজীবনকে বাঙলা সাহিত্যের উপাদনরূপে স্বীকার করে নিয়ে ভাব-ভাবনাগত নবযুগচেতনার সৃষ্টি করেছিল।"

শ্রীভূদেব চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)

চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ॥

লালন ফকির গেয়েছিলেন —"আয় দেখে যা নতুন ভাব আনল গোরা।"

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব আনীত এই নতুন ভাবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফসল চৈতন্যজীবনী সাহিত্য। দেব-দেবতার মাহাত্ম্যের বাইরে মানবজীবনকে নিয়ে এর পূর্বে বাংলায় কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। চৈতন্যদেব অবতারকল্প মহাপুরুষ-রূপে গৃহীত হলেও, নরদেবরূপে পূজিত হলেও তিনি ছিলেন রক্তমাংসের প্রত্যক্ষ মানুষ। এই প্রত্যক্ষ মানুষ চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি। এই জীবনীসাহিত্য থেকে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবনকে যেমন জানা যাবে, তারই সঙ্গে তৎকালীন দেশ ও সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদানও পাওয়া যাবে।

বাংলা ভাষায় এই মৌলিক জীবনীসাহিত্য ধারায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চারখানা। রচনার সময়ের দিক থেকে এদের ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে উল্লেখ করা কঠিন। কারণ গ্রন্থমধ্যে সন-তারিখের উল্লেখ নেই। পণ্ডিতগণের অনুমানকে ভিত্তি করে এই গ্রন্থ ক'খানাকে এই ক্রমে সাজানো যেতে পারে :—

১। বৃন্দাবনদাসের **শ্রীচৈতন্যভাগবত**

২। লোচনদাসের **চৈতন্যমঙ্গল**

৩। জয়ানন্দের **চৈতন্যমঙ্গল**

৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

চৈতন্যভক্ত মুরারী গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-

জীবনী রচনা করেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য চৈতন্য জীবনী এই চারখানা। অবশ্য এই চারখানার বাইরে গোবিন্দদাস কর্মকার একখানা কড়চা রচনা করেন। চূড়ামণি দাস 'গৌরাঙ্গ বিজয়' রচনা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে এই কাব্য দু'খানা প্রচারিত ছিল না। ঐ চারখানা গ্রন্থই চৈতন্য-জীবনী হিসেবে স্বীকৃত।

১। বৃন্দাবনদাস ও শ্রীচৈতন্যভাগবত :—

কবি বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ধমান জেলার দেনুর গ্রামে কবি বসবাস করেন। মাতা ছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণী। প্রচলিত আছে বৃন্দাবনদাসের জন্মকে সামাজিক করবার জন্য চৈতন্যদেব তাঁর চর্বিত তাম্বূল প্রসাদরূপে নারায়ণীকে দেন এবং গর্ভের সন্তানকে আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদ নিয়ে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন কবি ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যমধ্যে কবির খেদোক্তি থেকে অনুমান হয় কবি চৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করেন নি। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি এই কাব্য রচনা করেন।

চৈতন্যভাগবতের প্রথমে নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে চৈতন্যভাগবত রাখেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনখণ্ডে গ্রন্থখানা বিভক্ত। অধ্যায় রয়েছে ৫১টি। মহাপ্রভুর শৈশব থেকে নীলাচল গমন পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিধৃত।

চৈতন্যভাগবতের বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের সততা। এ কাব্যে মহাপ্রভুর গৌড়ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যেমন তথ্যবহুল তেমনি ঐতিহাসিক। গৌরলীলার বর্ণনাসূত্রে তৎকালীন নবদ্বীপের পটভূমি ও তার পারিপার্শ্বিক বঙ্গভূমির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভক্তি ও উচ্ছ্বাস দিয়ে চৈতন্য জীবনকথাকে কবি বিকৃত করেন নি। এ কাব্য একাধারে ইতিহাস ও চৈতন্যলীলার কথা। এই নিষ্ঠার জন্যই বৈষ্ণবসমাজে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলে খ্যাতিলাভ

করেছেন। অন্যদিকে এ গ্রন্থের সহজ ভাষা, সুললিত ছন্দ, বাস্তব বর্ণনা সাধারণের কাছে গ্রন্থখানাকে আদৃত করেছে। চৈতন্য-জীবনীসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ গ্রন্থের মূল্যায়ণ করে বলেছেন।—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

২। লোচনদাস ও চৈতন্যমঙ্গল :—

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী, পাঠান্তরে অরুন্ধতী। কবি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহ ছিলেন পুরুষোত্তম গুপ্ত। কবি তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ছিলেন দীক্ষাগুরু। জনশ্রুতি আছে কবিকে বাল্যকালে ফিরিঙ্গিরা অপহরণ করে। গুরু নরহরি তাঁকে উদ্ধার করেন। লোচনদাস বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। ভাগবত, জৈমিনী ভারত, মহাভারত, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন।

পণ্ডিতসমাজ মনে করেন ১৫৫০ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। চারখণ্ডে গ্রন্থখানি রচিত,—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং অন্ত্যখণ্ড। চৈতন্যদেবের বাল্যকাল থেকে শেষ বয়সের এবং প্রয়াণের বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। কবি গ্রন্থ পরিকল্পনায় মুরারী গুপ্তের কড়চার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। মঙ্গল-কাব্যের ঢঙে আসর জমানোর মানসিকতায় এই গ্রন্থ রচিত। ফলে অল্প-শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থ আদৃত হয়েছিল। তবে শিক্ষিত বৈষ্ণব-সমাজ গ্রন্থখানাকে চৈতন্যদেবের প্রামাণিক জীবনকথা বলে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁরা স্বীকার করেছেন চৈতন্যদেবের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা এ গ্রন্থে রয়েছে। বিশেষত চৈতন্যের দাম্পত্যজীবন এবং শচীমাতা ও চৈতন্যের সম্পর্ক এ গ্রন্থের আদৃত অংশ। গুরু নরহরি সরকার প্রবর্তিত গৌরনাগরীবাদের সমর্থক ছিলেন লোচনদাস। এই মতবাদ অনুসারে কবি মহাপ্রভুকে নাগর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং ভক্তমণ্ডলীকে গোপনারীদের মতো প্রেমিকা নাগরীরূপে কল্পনা করেছেন। করুণ রস সৃষ্টিতে লোচনদাসের গ্রন্থ বিশেষত্ব লাভ করেছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপদৃশ্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রন্থের ভাষা সুললিত এবং ছন্দ

নিপুণ। কাব্যরসের গুন এ গ্রন্থে যথেষ্ট রয়েছে। কবির ভক্তি ও আন্তরিকতায় মহাপ্রভুর এক ভক্তিরসসমৃদ্ধ চিত্র লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৩। জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল :—

জয়ানন্দের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনীদেবী। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকালের নাম ছিল গুঁইঞা। চৈতন্যদেব যখন সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, এক বছরের শিশু জয়ানন্দকে কোলে করে কবিমাতা চৈতন্যদেবের জন্য ভোগ রান্না করেন। সেই সময় চৈতন্যদেব এই শিশুর নতুন নামকরণ করেন জয়ানন্দ। কবি তাঁর গ্রন্থে নিজেকে 'অভিরাম গোঁসাঞির দাস' বলে উল্লেখ করেছেন। এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে অভিরাম শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে কবিকে গদাধর-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জয়ানন্দ নয়খণ্ডে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। গ্রন্থখানা মধ্যযুগে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল না। একালে এ গ্রন্থ আবিষ্কৃত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মতো জয়ানন্দের এই জীবনীকাব্যও জনসাধারণের জন্য রচিত। মঙ্গলকাব্যের রীতি ও আসর জমানোর মানসিকতা এ গ্রন্থেও রয়েছে। গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো কিছু নতুন তথ্যের পরিবেশন। চৈতন্যের আবির্ভাবের পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণের ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন। আবার চৈতন্যের প্রয়াণের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন পুরীধামে রথযাত্রায় নৃত্যকালে চৈতন্যের পায়ে ইঁট ফোটে। এই আঘাত চৈতন্যের মৃত্যুর কারণ।

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইঁটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥

কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজ এই মত সমর্থন করেন নি। বরং বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

সত্যনিষ্ঠার ও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার অভাবের অভিযোগ জয়ানন্দের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। বৈষ্ণব-সমাজ মনে করেন, এ গ্রন্থে ইতিহাসের চেয়ে গালগল্প রয়েছে বেশি। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি সম্পর্কে ও শচীদেবীর দীক্ষাদাতার পরিচয় সম্পর্কেও জয়ানন্দ এমন সব তথ্য দিয়েছেন, যা অন্য কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের দ্বারা অনুমোদিত নয়। বৈষ্ণব-সমাজের অভিযোগ, এই গ্রন্থে চৈতন্যনিষ্ঠার অভাব রয়েছে। বৈষ্ণব ঐতিহ্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। এ গ্রন্থে আদ্যাশক্তির বন্দনা রয়েছে এবং কালীমূর্তির বর্ণনা রয়েছে। এসব বৈষ্ণব ঐতিহ্য বিরোধী। যে নয়টি খণ্ডে এ গ্রন্থ বিভক্ত, তাদের মধ্যেও ক্রমবদ্ধতা নেই এবং উপস্থাপনা-রীতিও সংহতিবদ্ধ নয়। সার্থক জীবনীকাব্যের মর্যাদায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ভূষিত হতে পারে নি।

৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :—

চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের একস্থানে কবি নিজের সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় নৈহাটীর নিকটবর্তী ঝামাটপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। কবি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে নিত্যানন্দকে নিয়ে কবির বচসা হয়। নিত্যানন্দকে গালি দিলে ব্যথিত কবি স্বপ্নে দেখেন নিত্যানন্দ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বৃন্দাবনে যেতে বলেন। কবি বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। সেখানে রূপ সনাতন, রঘুনাথ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যের কাছে তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনের মহাজনমণ্ডলী তাঁকে চৈতন্যের ভাবজীবন অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব দেন। সেই দায়িত্ব গ্রহণের ফসল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। শোনা যায় এই গ্রন্থ যখন বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় পথে ডাকাতদল গ্রন্থ লুণ্ঠন করে। অকৃতদার আদর্শ বৈষ্ণব কবির মৃত্যুর কারণ এই দুঃসংবাদ।

পণ্ডিতগণ মনে করেন ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পর এ গ্রন্থ রচনা শুরু হয় এবং ১৬১২ থেকে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, অধ্যায় রয়েছে ৬২টি।

চৈতন্যচরিতামৃতই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে ইতিহাসের সততার অভাব রয়েছে, অভাব রয়েছে দর্শন ও শিল্পকলার। জয়ানন্দের

চৈতন্যমঙ্গলে নতুন তথ্য আছে, কিন্তু বৈষ্ণবঐতিহ্য ও চৈতন্যনিষ্ঠা নেই। তাছাড়া শিল্পকলা ও দর্শনেরও অভাব লক্ষিত। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্য-জীবনের একনিষ্ঠ ইতিহাস রয়েছে। ভক্তি ও উচ্ছ্বাস কোথাও ইতিহাসের সততাকে বিকৃত করেনি। কিন্তু চৈতন্যের মতাদর্শ, চৈতন্যদর্শন বৃন্দাবনদাসের কাব্যে যথেষ্ট নেই। সমগ্র বাংলাকে প্লাবিত করে দক্ষিণভারতে যে ভাবের বন্যা পৌঁছেছিল, পূর্বভারতকে যে ভাবের বন্যা আন্দোলিত করেছিল তার স্বরূপ জানবার আগ্রহ বৃন্দাবনদাসের কাব্য তৃপ্ত করে না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এই তৃপ্তির অমরাবতীতে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়। চৈতন্যদেব এবং চৈতন্য মতাদর্শ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে এই গ্রন্থ পূর্ণ বিকশিত। কৃষ্ণদাস ঐতিহাসিকের কৃচ্ছ্রসাধনা ও ভক্ত কবির সমর্পণ নিয়ে সেইসব কাহিনী চৈতন্যজীবন থেকে নির্বাচন করেছেন যা দিয়ে চৈতন্য জীবনাদর্শ সম্যকভাবে পরিস্ফুট করা যায়। কারণ এই জীবনাদর্শই সারাদেশে 'নতুন ভাব' এনেছিল। এই গ্রন্থ সেই চৈতন্যমহিমার দীপবর্তিকা। চৈতন্যের জীবনকাহিনী দীপশিখার মতো দাঁড়িয়ে চৈতন্যজীবনাদর্শের আলো বিকীরণ করবে—এই আদর্শই চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থের অকাঙ্ক্ষিত আদর্শ। সেদিক থেকে কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কবি তিনটি খণ্ডে চৈতন্য জীবনকাহিনী সন্নিবেশ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি। চৈতন্যের জীবন রয়েছে আদি ও মধ্য খণ্ডে। চৈতন্যের শেষ ১২ বছরের চরিতকথা কেবল এ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। দর্শন ও কবিত্ব রয়েছে অন্ত্যখণ্ডে। এই অন্ত্যখণ্ডই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্যের খনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমি এই অন্ত্যখণ্ড রচনা করেছে। চৈতন্যজীবনের তথ্য, দর্শন এবং তার সঙ্গে কবির কবিত্বের সমাবেশ যদি কোনো একখানা গ্রন্থে দেখতে হয়, সে হলো কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত। বৈষ্ণবসমাজ এই আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিকোণ থেকেই চৈতন্য-চরিতামৃতকে গ্রহণ করেছেন। বাঙালী মননশীলতা, দার্শনিকতা ও কবিপ্রতিভার দুর্লভ দৃষ্টান্তস্থল এই গ্রন্থ। কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণদাসের এই গ্রন্থ এক অসাধারণ জীবনী-কাব্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বৃন্দাবনের মহাজন মণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে এবং চৈতন্যজীবন ও দর্শনকে

জানবার আগ্রহকে পথ দেখিয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে শীর্ষস্থান করে নিয়েছে।

কৃষ্ণদাসের এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ষড়্ গোস্বামী বিশ্লেষিত বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনের সর্বগ্রাহ্য একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজে তিনি রূপসনাতন, রঘুনাথ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যের কাছে শাস্ত্র ও দর্শনে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই জ্ঞান ভারতবাসীকে প্রদান করলেন। সমগ্র কাব্যে এই গভীর পাণ্ডিত্য নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের বিনয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা' সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥

এই বিনয় তাঁর গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যকে বিশেষত্ব দিয়েছে। এক আদর্শ বৈষ্ণবের হাতে মহান বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন রচিত হলো। এই অন্তর সম্পদ, এই সৌন্দর্য ও মহত্ব লোচনদাসের, জয়ানন্দের এমন কি 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে নেই।

চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—"চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকতত্ত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"

[বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড]

*

॥ বলরাম দাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদাবলী ॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেকার বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বলরাম দাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তা। এই ত্রয়ী বৈষ্ণব পদসাহিত্যে একটি আলোকিত বলয়ের রচয়িতা। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস এই ত্রয়ীকে প্রভাবিত করেছেন। রসিক পাঠক জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের এবং গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে অভিহিত করে রসবিচারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। দুই যুগের পদকর্তাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য হল, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদে রসোৎকর্ষ ছিল, গূঢ় ভক্তির কথা ছিল, কিন্তু দর্শন ছিল না। চৈতন্য-সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষ্ণবপদে গভীর দর্শন এলো এবং তা রসোত্তীর্ণ রূপ লাভ করল। চৈতন্যদেবের আবেগ-আর্তির মধ্যে, তাঁর জীবনসাধনার মধ্যেই কবিরা দার্শনিক তত্ত্বকথা ও কৃষ্ণপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ আস্বাদন করলেন। কবিরা একই সঙ্গে রচনা করেন গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বা গৌরচন্দ্রিকা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা পদ।

ক. বলরাম দাস ॥

তোমায় আমায় একই পরাণ/ভাল সে জানিয়ে আমি
হিয়ার হইতে বাহিনু হইয়া/কিরূপে আছিলা তুমি ॥

[বলরাম দাস]

কবি পরিচয় ॥

বলরাম দাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এই নামের একাধিক পদকর্তার ভীড়ে তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা আরো কঠিন। খ্যাতি-মান পদকর্তা বলরাম দাস জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়া গ্রামে ছিল তাঁর বসতি। তাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট। বলরাম দাসের পদের সংখ্যা স্বল্প। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় তিনি পদ রচনা করেন। পূর্বসূরী জ্ঞান গোবিন্দের

সমসাময়িক বলরাম দাস। তাঁদের প্রভাবও তাঁর কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু ভাবের গভীরতাই তাঁর কাব্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই গুণেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের অনুরাগী ছিলেন।

বলরামদাসের পদাবলী ও কবিপ্রতিভা ॥

প্রধানত সখ্য ও বাৎসল্যের পদরচনায় বলরাম দাসের কবি-প্রসিদ্ধি। শিশু গোপালের জন্য স্নেহময়ী যশোদার হৃদয়ে সদাই উৎকণ্ঠা। শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গে গোষ্ঠে চলেছেন গোপাল। পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় যশোদার ব্যাকুলতা :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায়ে জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ॥

এই যশোদা সন্তানের অনিষ্ট আশঙ্কায় শঙ্কিতা বাংলার অতি পরিচিত এক মা। গার্হস্থ্যরসে নিটোল এই পদ। সৌন্দর্য বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত বলরাম নিসর্গকে কেবল নিসর্গরূপেই চিত্রিত করেননি। মানব প্রকৃতির বিচিত্র ভাবদ্যোতনার প্রতিকল্প হিসাবে অবলম্বন করেছেন বিশ্বপ্রকৃতিকে। বর্ষার মেঘমন্দ্রধ্বনি, মেঘসমাচ্ছন্ন অম্বরতল—সর্বত্র প্রতিবিম্বিত দেখেছেন রাধাপ্রেমকাতর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরজগৎ। দোলের আনন্দলীলায় যখন ব্রজবাসীবৃন্দ মত্ত হয়ে উঠেছে, ফাল্গুনের আবীর রঙে রঞ্জিত যখন সবার হৃদয়-মন, তখন কৃষ্ণ অন্তরে বড় একা। শ্রীরাধা বিহনে তিনি 'বিরহ আগুনি জরি জরি', আনন্দের যাবতীয় আয়োজন তাঁর কাছে অর্থহীন লাগে। বিরহবোধের গভীরতায় বলরামের কৃষ্ণচরিত্র অভিনব।

বলরাম দাসের কৃষ্ণ একাধারে জীব ও আত্মা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা। উভয়ের একাত্মতায় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। এই মিলন এবং পুনর্মিলনের দোলাচল চিরকালের। ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের মিলনের জন্য উভয়েরই নিরন্তর আকুলতা। রাধার সঙ্গে

মিলিত হবার পরক্ষণেই কৃষ্ণের বিরহ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে—

হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত্ত নহে স্থির।

মিলন-বিরহের এই চিরকালীন দ্বন্দ্ব, প্রেমের এই লোকাতীত স্বরূপ প্রকাশের দুর্লভ অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি বলরাম দাসের কবিপ্রতিভার উল্লেখযোগ্য দিক। এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

খ. জ্ঞানদাস ॥

কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।

কবি পরিচয়

হৃদয়ের গভীরতম মর্মকথাকে যিনি বাণীবদ্ধ করতে পেরেছেন তিনিই জ্ঞানদাস। বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরিচয় এখনো উদ্‌ঘাটিত হবার অপেক্ষায় আছে। জানা যায়, নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত এই কবি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানদাসের ভণিতায় প্রায় ৪০০ পদ পাওয়া গিয়েছে। বাংলা এবং ব্রজবুলির উভয় ভাষায় জ্ঞানদাস পদ রচনা করেছেন। বাংলা পদেই তাঁর উৎকর্ষ।

জ্ঞানদাসের পদাবলী ও কবি প্রতিভা ॥

কবিপ্রকৃতিতে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। চণ্ডীদাসের মতোই জ্ঞানদাসের ভাবলোকে বিরাজিত ছিল একটি ভক্ত চিত্ত। ভক্তের বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তিনি অবলোকন করেছেন প্রেমের রূপবৈচিত্র্যকে। তাঁর শিল্পচেতনা থেকে জন্ম নিয়েছে সার্থক কবিতা। কাব্যকৃতির অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁকে ভক্তের আসন থেকে কবির আসরে এনে দিয়েছে। বস্তুত কবি জ্ঞানদাসকে ভক্ত জ্ঞানদাসের চেয়ে বড়ো মনে হয়। এখানে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হয়েও জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর কাব্যে অনুরণিত হয়েছে প্রেমের অন্তহীন অতৃপ্তি কখনো আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়, কখনো বিচ্ছেদ-ভাবনার সকরুণ আশঙ্কায়। জ্ঞানদাসের আবেগস্পন্দিত

বাণী যে প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়েছে তাতে আধুনিক গীতিকবিতার স্বরূপ সুস্পষ্ট।

জ্ঞানদাসের রাধা যখন বলেন,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

তখন এক কৃষ্ণ-কামনায় তৃষিত চাতকিনী যেন আধুনিক কাব্যভাষায় কথা বলে ওঠে। আকুতি আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে রাধিকার আত্মহারা তন্ময়তায়। এমন আবেগমথিত সঙ্গীত বাংলা কাব্যসাহিত্যে দুর্লভ।

তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥

এই কাব্যোক্তি কেবল কল্পিত কোন রাধাকৃষ্ণের নয়। বিশ্ব সংসারের প্রেমমুগ্ধ নরনারী তো এই ভাষাতেই মুক্ত করে হৃদয়দুয়ার। এ ভাষা যুগাতীত কালাতীত প্রেমের ভাষা। প্রেম-কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে থাকবে জ্ঞানদাসের পদ।

রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর মধুরতার অপূর্ব সমন্বয়ে জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদ সমুজ্জ্বল। তবে আক্ষেপানুরাগ ও রূপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস অনন্য। কৃষ্ণকে দেখে রাধার চিত্ত অধীর; যৌবনের জাগ্রত অনুরাগ রাধাকে দিশাহারা করে দিয়েছে। তাঁর এই প্রেমাপ্লুত আবেশ সুনির্বাচিত রূপকল্পে অঙ্কিত হয়েছে। 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল'—এই রূপকল্প প্রথম শ্রেণীর কবির কলমের স্বাক্ষর।

অন্যত্র শ্রীরাধার গতিচঞ্চল পদচারণকে জ্ঞানদাস বর্ণনা করেছেন আশ্চর্য ছন্দের ব্যঞ্জনায়—

'উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উথারি॥'

শ্রীরাধার ত্রাস্ত পদক্ষেপনের সৌন্দর্য যেমন অভিভূত করেছে কৃষ্ণকে তেমনি এর কাব্যোৎকর্ষে চমৎকৃত হয়েছেন জ্ঞানদাসের পাঠকবর্গ। চণ্ডীদাসের রাধা বিষাদের

প্রতিমা, জ্ঞানদাসের রাধা প্রাণাবেগে উচ্ছলা। কৃষ্ণ সন্দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর দেহের দুকুল ছাপিয়ে উঠেছে। তাঁর গভীর গোপন পুলক আভাসিত হয়েছে তাঁর অঙ্গ বিক্ষেপে। চণ্ডীদাস সাধক, ভাবুক; জ্ঞানদাস প্রধানত শিল্পী ও রূপস্রষ্টা। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সাফল্য বিরহের চিত্র অঙ্কনে। জ্ঞানদাসের বিরহ অংশেও দেখা যায় বেদনার মধুর ক্রন্দন। কৃষ্ণ-বিরহকাতর রাধা কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল। তিনি যোগিনীর বেশে মথুরার প্রতি ঘরে কৃষ্ণের সন্ধানে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও তাঁর আত্মবিলাপ ধ্বনিত হয়েছে এই বহুখ্যাত পদটিতে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি হে, কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।

তবু মিলন দৃশ্যে রাধার আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি যেন তাঁর সব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে দেয়! কৃষ্ণমিলনের আনন্দে বিভোর রাধা—

'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে। বিচলিত চীর অঙ্গে।
নিন্দ যাই মনের হরিষে।'

জ্ঞানদাসের বহুপদেই কাব্যব্যঞ্জনা এ যুগের সংবেদনশীল পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করবে।

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হৈয়া
কিরূপে আছিলা তুমি।।

মিলন বিরহের এই অন্তহীন জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করেছেন কবি সহজতম ভাষায়। জীবনবোধের এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে এমন অনায়াসে কাব্যের আঙ্গিকে বিধৃত করতে সক্ষম হয়েছেন জ্ঞানদাস। এখানে তাঁর দৃষ্টি ও চেতনা মধ্যযুগের ভক্তিরস সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করেছে।

গ: গোবিন্দদাস ॥ 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'

কবি পরিচয়

ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যের পদকর্তা গোবিন্দদাস। অসাধারণ পাণ্ডিত্যকে অসাধারণ কবি প্রতিভায় জারিত করে নিয়ে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস শত শত বছর ধরে বাঙালীর রসিক চিত্তকে জয় করেছেন।

কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন নির্ণয় করেছেন, ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অনুগ্রহভাজন। শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষালাভ করেন।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণব রসসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল গভীর। তাঁর কাব্যের বহুস্থানেই তাঁর সুগভীর অনুধ্যান ও পাণ্ডিত্যের প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব বিনয়বশতঃ 'দাস' উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। কাব্যসিদ্ধির পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন 'কবিরাজ' উপাধি। গোবিন্দদাসকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন বৃন্দাবনের শ্রীজীবপ্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ। গোবিন্দদাসের ভণিতায় ৭০০-রও বেশি পদ পাওয়া গিয়েছে। এর অধিকাংশই ব্রজবুলিতে রচিত। ব্রজবুলি পদেই তাঁর উৎকর্ষ।

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও কবি প্রতিভা ।।

রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়কে অবলম্বন করে গোবিন্দদাস বহু পদ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অভিসার পর্যায়ের পদে এবং গৌরচন্দ্রিকায়। এইসব পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির শ্রবণলোভন ধ্বনিমাধুর্য ও প্রখর অনুভব আত্মস্থ করে তার সঙ্গে চৈতন্যযুগের ভক্তিভাব যুক্ত করে গোবিন্দদাস এক অপূর্ব গীতিধারা সৃষ্টি করলেন।

গোবিন্দদাসের রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই তীব্র অনুভূতিপ্রবণ। রাধাপ্রেমে বিভোর কৃষ্ণ দয়িতার অঙ্গে অঙ্গে প্রত্যক্ষ করছেন বিদ্যুৎপ্রভা, পদক্ষেপে দেখছেন পদ্মের প্রস্ফুটন।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি ॥

যাঁহা যাঁহা তরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল-খলই ।।

অনুরূপ রূপমগ্নতা রাধার দৃষ্টিতেও। যৌবনময়ী রাধা কৃষ্ণরূপের ছটায় আত্মহারা। এক সর্বগ্রাসী আকর্ষণের তীব্রতা তাঁর কাছে দুঃসহ বলে বোধ হয়।

আধক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুমশরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ ।।

কামনাজর্জর রাধার এমন চিত্রার্পিত সৌন্দর্য পদসাহিত্যে বিরল। গোবিন্দদাসের সূক্ষ্মদৃষ্টি উন্মোচিত করেছে রাধার সলজ্জ নারীস্বভাবকে। প্রিয়মিলনের দুর্বিনীত কামনাও প্রতিহত হয়েছে লজ্জায়। কৃষ্ণস্পর্শে রাধা শঙ্কিতা ভীতা।

কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠার প্রথম বাধা অতিক্রম করে মিলন বাসনায় দুর্বার হতে দেখা যায় রাধাকে। প্রিয় সন্নিধানে যাবার প্রস্তুতিপর্বের বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়েছেন অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাস। কর্দম পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ, পথের দূরত্ব —সম্ভাব্য সকল বাধা অতিক্রমণের জন্য রাধার প্রাণপণ প্রয়াস চমৎকার ছন্দে বিধৃত করেছেন কবি।

কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরিবারি ঢালি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি ।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

রাধার এমনই দুঃসাধ্য সাধনা, নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন। তবু নব-অনুরাগিনী রাধা দুর্বার। হৃদয় যার প্রিয় অভিসারে প্রমত্ত হয় সে এমনি করেই বুঝি তুচ্ছজ্ঞান করতে চায় বর্ষার প্রাবল্য, অন্ধকারের ভয়াবহতা কিংবা পথের দুর্গমতা। সব বাধা তুচ্ছ করে গোবিন্দদাসের রাধার অভিসার শুরু। শ্রীহস্তের লীলাকমল, কেশদামে বিজড়িত মালতী মালা, কণ্ঠের মণিময় হার সবই পরিত্যক্ত হল একে একে। এমন নিখুঁত অবলোকন ও চিত্রায়নের শিল্পী গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস অভিসার পদের একজন সার্থক পদকর্তা। অভিসারের পদে তিনি রাজাধিরাজ। বিদ্যাপতির অভিসারপদ অলঙ্কার-বহুল। গোবিন্দদাসের অভিসারে প্রাণাবেগ ও

আত্মবিশ্বাস। গোবিন্দদাসকৃত অভিসারপদের রূপ বৈভবে ও ধ্বনিঝঙ্কারে একটি দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। এসব পদের লাবণ্য যেমন যুগে যুগে কাব্যপিপাসু পাঠকের চিত্তে তৃপ্তি এনে দিয়েছে, তেমনি তাদের ধ্বনিমাধুর্য্য লোকসমাজে আদৃত হয়েছে। বাংলার কীর্তনিয়া সমাজ গোবিন্দদাসের বহু পদ কীর্তনের আসরে পরিবেশন করে আসছেন বহুকাল ধরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

গোবিন্দদাসের অন্যতম কৃতিত্ব নিসর্গ বর্ণনা। রাধাকৃষ্ণের মিলনের আনন্দে প্রকৃতিও যেন সাড়া দিয়েছে। পত্রে-পুষ্পে-আকাশে-মাটিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে লাবণ্যের দীপ্তি, আনন্দের উচ্ছ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে বিশ্বচরাচরে স্পন্দিত হয়েছে নূতন প্রাণস্পন্দন। নির্বাক প্রকৃতিকে গোবিন্দদাস করে তুলেছেন বাঙ্ময়। শ্রীকালিদাস রায় সার্থকভাবেই গোবিন্দদাসের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন '...তিনি কেবল লীলার বর্ণনা করিতেছেন না—তিনি লীলাসঙ্গী—নিজের চোখে লীলারস উপভোগ করিতেছেন, তিনি শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী—সাথের সাথী—সুখে সুখী।' রাধার প্রতি গভীর সমবেদনায় গোবিন্দদাস বলে উঠেছেন 'হাহা প্রাণ রাই। ভেল অচেতন। গোবিন্দদাস করু কোর।' গোবিন্দদাসই একমাত্র পদকর্তা যিনি রাধাকৃষ্ণের একটি ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। ধ্বনি ঝংকার, কাব্যের চিত্রাবয়ব, ছন্দের কারুকার্যে এমন অনায়াস দক্ষতা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস—রসগ্রহণে ও পরিবেশনে উভয়ের দক্ষতা অসামান্য। তবু উভয়ের কবিপ্রকৃতিতে কিছু স্বাতন্ত্র্যও চোখে পড়ে। বিদ্যাপতি উচ্চকণ্ঠ, অনুপ্রাস ও অলংকারের বাহুল্য থেকে তাঁর কাব্য অনেকটা মুক্ত। গোবিন্দদাসের কাব্য মৃদঙ্গ ধ্বনির মত মন্দ্রিত। ধ্বনিগাম্ভীর্য সাধনের জন্য কোথাও যুক্ত ব্যঞ্জন, অনুপ্রাসের আধিক্য ঘটেছে। বিদ্যাপতির ভক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কবিত্ব। গোবিন্দদাসের কবিচিত্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে ভক্তি বিনম্রতা। বিদ্যাপতি রাজসভাকবি এবং কাব্যের বর্ণাঢ্য রূপই রাজমনোরঞ্জনের অনুকূল। তাই বিদ্যাপতির রাধা সালঙ্কারা, প্রসাধিত, খরদীপ্তিময়ী নায়িকা। সহজ হৃদয় ধর্মের পথে তাঁর যাত্রা। কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা ভাববিভোর, গভীর উপলব্ধি সমৃদ্ধ। তাঁর যাত্রাপথের লক্ষ্য জীবনের পরমতম প্রাপ্তি। এর কারণ বোধ করি এই যে গোবিন্দদাসের কাব্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশ চৈতন্য ভাবদীপ্ত পরিমণ্ডলে যার, থেকে বহু দূরে

ছিল বিদ্যাপতির জীবন ও পরিবেশ।

চৈতন্যবন্দনায় কবির কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভুর নৃত্যরত দেহের স্বেদবিন্দুতে তিনি ভাব-কদম্বের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন। ভাবাবিষ্ট হৃদয়ানুভূতির এমন চিত্রার্পিত প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ। কল্পতরু সদৃশ চৈতন্যের উদার প্রেম বিতরণে গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ মুখর। কবি সেই পুণ্য নামকীর্তনকে প্রতিধ্বনিত করে লিখেছেন—

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর।

চৈতন্যপ্রাণতার প্রবল তরঙ্গ একদিন পরিপ্লাবিত করেছিল বাংলার যুগপরিবেশকে, বাংলার সাহিত্যকে। গোবিন্দদাস তাকে কাব্যময় করে তুলেছেন।

❊

ধর্মমঙ্গল

কেঁদনা সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥
—ঘনরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল রাঢ়ের বীরগাথা। সেকালে বাংলার প্রবেশদ্বার রাঢ়ভূমির অধিবাসিগণ মোগল-পাঠান-বর্গীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করেছিলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের বীরত্বে উদ্দীপ্ত ধর্মমঙ্গলের নানা ঘটনা তৎকালীন বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্যের স্বাক্ষর বহন করে।

ধর্মমঙ্গলের দেবতা ধর্মঠাকুর। মনসা বা চণ্ডীর মতোই ধর্মঠাকুর প্রাচীন দেবতা। তবে ইনি পুরুষ দেবতা। তাঁরই লীলাকাহিনী বিষয়ক কাব্যগুলি ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত। বৌদ্ধের ত্রিরত্ন, হিন্দুর সূর্য, শিব, বিষ্ণু, এবং ক্রমে তুর্কী যোদ্ধার রূপের এক অভূতপূর্ব ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায়। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে ধর্মমঙ্গল এক স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে বাংলার মঙ্গল সাহিত্যে।

ধর্মঠাকুর অনার্যজনসমাজের কল্পনাসম্ভূত দেবতা। মূলত নিম্নবর্ণের এই দেবতা ধর্ম-ঠাকুর, ধর্মরাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত। কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই মূর্তিহীন ধর্মঠাকুরের প্রতীক। রাঢ় বাংলায় বৃক্ষতল, নদীতীর, উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁর পূজাস্থান। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরে ধর্মঠাকুরের কিছু মন্দিরও দেখা যায়। দু-একটি মন্দিরে বিশাল বীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পূজার বলি ছাগ, হাঁস, মুরগী, পায়রা। ভক্তদের বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের কৃপায় রোগ-শোক, আধিব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়; কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হয়, বন্ধ্যা নারী পুত্র লাভ করে।

ধর্মমঙ্গল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো গীতযোগ্য কাব্য। গায়কের সম্মুখে থাকে ঘট, হাতে চামর, পায়ে নূপুর। মৃদঙ্গ মন্দিরার তালে তালে চলে গান বারো দিন

ব্যাপী। কাহিনীতে প্রচ্ছন্ন আছে সমকালীন সমাজ। যে কূটচক্রান্তে বাংলার তৎকালীন রাজনীতি উথাল পাথাল হচ্ছিল তার ইঙ্গিত কাব্যে সুস্পষ্ট। কাব্যোক্ত মন্ত্রী মহামদের মতো অসংখ্য মহামদ সেদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার তরঙ্গ তুলেছিল। তার দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল নিরপরাধ প্রজাবৃন্দকে। অবহেলিত নিম্নবর্ণের জনসমাজ সেদিন ধর্মমঙ্গলের বীর যোদ্ধা লাউসেন আর কালু ডোমের বীরত্বের মধ্যে যেন প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল।

কাহিনী॥

সকল ধর্মমঙ্গল কাব্যেই দুটি কাহিনী দেখা যায়। একটি হল রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, দ্বিতীয়টি লাউসেনের।

লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনীই ধর্মমঙ্গলের মূল উপাখ্যান। এ কাব্যেও মর্ত্যে আপন পূজা প্রবর্তনের জন্য স্বর্গের দেবতার ব্যাকুলতা। ধর্মঠাকুরের ইচ্ছাপূরণের প্রয়োজনেই স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্ম নিলেন রমতি নগরে বেণু-রায়ের কন্যারূপে। এ কাব্যের নায়ক লাউসেন। তিনি এক শাপভ্রষ্ট দেবতা। ঢেকুর গড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে চরম পরাজয় বরণ করলেন সামন্ত রাজা কর্ণসেন। যুদ্ধে হারালেন তাঁর ছয় পুত্রকে। গৌড়েশ্বর আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ দিলেন কর্ণসেনের সঙ্গে। রাজার শ্যালক মন্ত্রী মহমদ এ বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ধর্মের উপাসিকা রঞ্জাবতী যে পুত্রলাভ করলেন তারই নাম লাউসেন। মাতুলের হীন চক্রান্ত উপেক্ষা করে লাউসেন মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হলেন। চারিত্রিক সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চণ্ডীর কাছ থেকে লাভ করলেন দিব্য খড়্গ। বীর লাউসেন প্রতিষ্ঠা করলেন নিজ রাজ্য। মহামদের চক্রান্ত কিন্তু অব্যাহত রইল। গৌড় রাজের নির্দেশে লাউসেন প্রেরিত হলেন কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। বিজয়ী লাউসেন কামরূপের রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করে সগৌরবে ফিরে এলেন।

মহামদের তৃতীয় চক্রান্ত আবর্তিত হল সিমূলের রাজা হরিপালের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে। রূপসী বীর্যবতী এই রাজকন্যা কানাড়া চণ্ডীর উপাসিকা। চণ্ডীর কাছ থেকে প্রাপ্ত লৌহ নির্মিত গণ্ডারের মাথা যে কাটতে পারবে কানাড়া তাকেই

স্বামীত্বে বরণ করবে। লাউসেন এই অসাধ্য সাধন করে লাভ করলেন কানাড়াকে। পুনরায় তাকে যেতে হল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এবারেও তিনি জয়ী হলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ তাঁর রাজ্য ময়নাগড় আক্রমণ করল। লাউসেনের ডোম সেনানী বীর কালু এবং তাঁর স্ত্রী লখা পুরীরক্ষায় প্রাণ দিলেন। লাউসেন ধর্মঠাকুরের শরণ নিলেন। ধর্মের কোপে মহামদ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে শঠতার শাস্তি পেল। ধর্মের কৃপায় বেঁচে উঠল লাউসেনের মৃত ডোম সৈন্যবাহিনী, 'সেনাপতি কালু ও তার স্ত্রী লখা।

লাউসেনের'রাজ্য ও রাজত্ব নিষ্কণ্টক হল। প্রতিষ্ঠিত হল ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য। লাউসেন ও রঞ্জাবতীর স্বর্গপ্রত্যাবর্তনে কাব্যের সমাপ্তি।

ধর্মমঙ্গলের কবি।।

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসেবে নানা ধর্মমঙ্গল কাব্যে ময়ূর ভট্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কোনো প্রামাণিক কাব্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন অন্তত বিশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ রায়। এঁরা সকলেই সপ্তদশ শতকের কবি। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকে কাব্য রচনা করেন।

ক. রূপরাম চক্রবর্তী ।।

সপ্তদশ শতকের যে-কজন কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তী। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন অনাদ্যমঙ্গল। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'রূপরাম বোধ হয় ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি যিনি লাউসেনের কাহিনীকে ছড়া-পাঁচালী ও ব্রতকথার সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলকাব্যের আকার দিয়েছেন।' আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি রঞ্জাবতীর মনোবেদনাকে ভাষা দান করেছেন। এ কাব্যের আত্মকথা অংশ প্রশংসার্হ। বাস্তব চিত্রাঙ্কণে কুশলতা কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্র চিত্রণে কবির কুশলতা উল্লেখযোগ্য।

পুত্রবর নাহি পাই শালে গিয়া মরি।
মনে পুনর্বার জীব হেন সাধ করি ॥
কি কহিব কাহারে এ বচন অগাধ।
এমন বয়সে মরি বিধাতার সাধ ॥

জীবনের প্রতি এমন তীব্র মমত্ব বোধ বিরল। রূপরামের কাব্য জীবন ধর্মের জয়-গাথা।

খ. ঘনরাম চক্রবর্তী ॥

কবি পরিচয়

ঘনরাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির আখ্যা দেওয়া হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়। বর্ধমান জেলায় কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন।

কাব্য ও কবিপ্রতিভা ॥

কাহিনী-উপকাহিনীতে সমাকীর্ণ ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গল' ২৪টি পালায় বিন্যস্ত এক সুবৃহৎ গ্রন্থ। মহাকাব্যোপম এই গ্রন্থে যেমন অজস্র ঘটনার সমারোহ, তেমনি অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ। যথাযোগ্য কবিশক্তির অভাবে সংগৃহীত উপাদানসমূহ কোন সুগঠিত কাব্যরূপ লাভ করে নি। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ-ই বলেছেন: 'যে বিধিদত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের অভাব দৃষ্ট হয়।'

এ কাব্যের নায়ক লাউসেন। বীরত্বে বলীয়ান পুরুষ। বহু কঠিন বিপজ্জাল ছিন্ন করতে হয়েছে তাঁকে। জটিল পরিস্থিতিতে যে বীর্যবত্তা তাঁর পৌরুষকে সমুন্নত করতে পারত তাঁর স্রষ্টা তাঁর চরিত্রে সেসব গুণাবলি সংযোজিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানবিক পরাক্রমের অভাবে বারংবার তাঁকে সাহায্য নিতে হয়েছে অলৌকিক দৈব শক্তির। সমগ্র চরিত্রটি যেন অদৃশ্য দৈবের ক্রীড়নক। দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করিবেন না।' প্রশংসার একটা দিক অবশ্য আছে। সে হলো লাউসেন-চরিত্রের নৈতিক বোধ। বীরত্বের সঙ্গে নৈতিকতা যুক্ত হওয়ায় লাউসেন বিশেষত্ব লাভ করেছেন। অপর

দিকে শঠচরিত্র মহামদকে তিনি কুটিলতা ও হিংসার প্রতিমূর্তি করে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কণ করেছেন। চরিত্রের বৈপরীত্য সৃষ্টিতে দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নারীচরিত্র অঙ্কনে ঘনরামের দক্ষতা বরং ফলপ্রসূ হয়েছে। কাব্যোক্ত রমণীরা বাঙালী রমণীর পরিচিত কোমল লালিত্য ত্যাগ করে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়েছে বীরদর্পে। ঘনরাম তাঁর নায়িকার দৃঢ় হস্তে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন, দুঃসাহসে দীক্ষিত করেছেন তাঁদের। আবার গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা পরম নিষ্ঠায়। ললিতে-কঠোরে গড়া নারী চরিত্রগণ শ্রীধর্মমঙ্গলের অপূর্ব সম্পদ। ঘনরাম চক্রবর্তীর কৃতিত্ব নারী-চরিত্র চিত্রণে। মার্জিত রুচির পরিচায়ক ঘনরামের কাব্য। মঙ্গলকাব্যে যে গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা লক্ষণীয় ঘনরামের কাব্যে তা অনুপস্থিত। যে পরিমিতি বোধ মুকুন্দরামে, ভারতচন্দ্রে রয়েছে, ঘনরামে তা লভ্য।

কবি ঘনরাম পুরাণ সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। রাজ-সভা, সমরাভিযান, সামন্তরাজার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির বহু বিস্তৃত বর্ণনার সমারোহ ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে। গৌর রাজের শিবির সন্নি-বেশের চিত্র :

কানাত পড়িল কত সিফায়ের ডেরা।
পরিসর আড়ে দীর্ঘ বার ক্রোশ ধরা ।।
রাজার কানাত তামু আগে করে শোভা।
নীলপীত পিঙ্গল ধবল পিঙ্গল আভা ।।
নানা চিত্র চামর চৌদিকে শোভা পায়।
কলধৌত কলপে পতাকা উড়ে যায় ।।

এই বর্ণনায় শব্দসম্ভারে ও বর্ণনাচাতুর্যে কবির কাব্য-প্রতিভার পরিচয় আছে। সংহতি সাধন ও সংযম রক্ষার কৌশল আয়ত্তে থাকলে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কাব্যের নির্দশন হয়ে থাকতে পারত।

❋

মহাভারত

বাঙালীর রসচেতনার কাছে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে পার্থক্য হলো রামায়ণে গার্হস্থ্য জীবনের উপাদান প্রচুর ছিল, বাঙালী তাকে ঘরের কথা করে নিতে পেরেছিল। কিন্তু মহাভারতে তা অনুপস্থিত। মহাভারতে প্রধান স্থান যুদ্ধ-বিগ্রহের, জয়-পরাজয়ের, ন্যায়-নীতির। মহাভারত একান্তভাবেই আর্যবীর্যগাথা; এইজন্যই মহাভারতকে রাজদরবারের আওতা থেকে জনজীবনে বার করে আনার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। বাংলার সে প্রতিভা কাশীরাম দাস। কাশীরামের পূর্বে মহাভারতের বাংলা অনুবাদের যে চেষ্টা হয়েছে তা রাজ-দরবারের আওতায়ই হয়েছিল। রাজার আনুকূল্যে সে চেষ্টা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরনন্দী। প্রাচীন অনুবাদকের মধ্যে সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। অবশ্য সঞ্জয় সম্বন্ধে এখনও সংশয় দূর হয়নি।
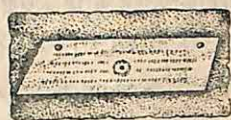
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর॥

সুলতান হুশেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ) সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ছিলেন পরাগল খাঁর সভাকবি। পরাগল খাঁ বিদ্যোৎসাহী ও হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মহাভারতের বীর্যগাথার কথা শুনে তিনি মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। সভাকবিকে নির্দেশ দেন, এমন একখানা মহাভারত রচনা করতে হবে, যা একদিনে শোনা যাবে। রাজার নির্দেশে পরমেশ্বর মহাভারতের মূল কাহিনী 'দিনেক' শ্রোতব্য করে অতি সংক্ষেপে অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁ মহাভারতের দর্শন ও কাব্য রসাস্বাদনে আগ্রহী ছিলেন না, যুদ্ধ কাহিনীর উত্তেজনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। সুতরাং কবির

অনুবাদেও মূল মহাভারতের আস্বাদ নেই, কেবল কাহিনী রয়েছে। সুলতানের আগ্রহের মনস্তাত্ত্বিক দিক অনুধাবন করেই কবি অনুবাদের নামকরণ করেন 'পাণ্ডব বিজয়'। পরাগল খাঁর নির্দেশে রচিত বলে এই অনুবাদ 'পরাগলী মহাভারত' নামেও পরিচিত।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ হুশেন শাহের সিংহাসন লাভের সময় (১৪৯৩ খৃঃ) থেকে তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্ব-কালের (১৫৩২ খৃঃ) সময়সীমায় পরমেশ্বর এই মহাভারত রচনা করে থাকবেন। বাংলা মহাভারতের আদি অনুবাদক কে, এ নিয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। কিন্তু পুঁথিপত্র বিচার করে পণ্ডিতমহল এখন পর্যন্ত পরমেশ্বরকেই বাংলা মহাভারতের প্রাচীনতম কবির মর্যাদা দিয়েছেন।

খ. শ্রীকর নন্দী ॥

শ্রীকর নন্দীও রাজসভা-কবি। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ বা নসরৎ খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। হুশেন শাহের পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পিতার মতো ছুটি খাঁও বিদ্যোৎসাহী ও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। মহাভারতের পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ ছুটি খাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করতে সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে তিনি নির্দেশ দেন। শ্রীকর নন্দী কিন্তু বেদব্যাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করলেন না। কবি জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। সমালোচকরা অনুবাদের সুখপাঠ্যতা ও হাস্যরসগুণের প্রশংসা করেছেন।

মহাভারতের যেসব অনুবাদ রাজার ইচ্ছায় হলো রাজদরবারেই তা আবদ্ধ রইল। দেশবাসীর ভারতরস পানের আগ্রহ পরিতৃপ্ত হলো না। সংস্কৃত ভাষার জটাজাল থেকে এবং রাজদরবারের আওতা থেকে মহাভারতের রসস্রোতকে স্ববলে ভাষাপথ খনন করে বাংলার সমতলে যিনি বাহিত করে দেন তিনিই কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম বাংলার সংস্কৃতি-জীবনের দুই প্রধান পুরুষ—দুই জাতীয় কবি।

গ. কাশীরাম দাস ॥

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান॥"
—মধুসূদন দত্ত

কাশীরাম দাসের পরিচয়॥

কৃত্তিবাসের মতো কাশীরাম দাসের ব্যক্তিপরিচয় নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যে কবির কিছু উক্তি এবং তাঁর অগ্রজ-অনুজদের রচনা থেকে কিছু তথ্য আশ্রয় করে কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে কবির জন্ম। কবির উপাধি 'দেব', জাতিতে কায়স্থ। বংশানুক্রমিকভাবে কবি বৈষ্ণব ছিলেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামের আরো দুই ভাই ছিলেন—অনুজ কৃষ্ণদাস ও অগ্রজ গদাধর। তাঁরাও কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কবি মহাভারত পাঁচালী রচনায় উৎসাহিত হন কবির গুরু অভিরাম মুখোটির উপদেশে। একাধিক পুঁথি বিচার করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্তে আসেন যে কাশীরাম ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মহাভারত অনুসরণে ভারত-পাঁচালী রচনা করতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন পুঁথি থেকে জানা যায় কাশীরাম গ্রন্থ সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব এবং বিরাট পর্বের কিছু অংশ—এই সাড়ে তিনপর্ব রচনা করে কবি দেহত্যাগ করেন। বাকি অংশ রচনা করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। কৃত্তিবাসের মতো কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত। তার ফলে একখানি নির্ভরযোগ্য রামায়ণ বা মহাভারত আজও সম্পাদিত হতে পারে নি।

কবি প্রতিভার মৌলিকত্ব॥

কাশীদাসী মহাভারতের প্রধান পরিচয়, এটি বাঙালীর মহাভারত। রাজসভার আওতা থেকে আর্যবীর্য গাথাকে বাংলার গৃহসভার আওতায় নিয়ে এলেন কাশীরাম। মহাভারতে রামায়ণের মত বাঙালীর উপযোগী গার্হস্থ্য জীবন-উপাদান নেই। কিন্তু

কুন্তী, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর জীবনবৃত্তকে কাশীরাম বাঙালীর যৌথ-পরিবারের জীবনবৃত্তে তুলে এনেছেন। এ এক অসাধারণ প্রতিভার কাজ। এখানেই তাঁর মৌলিকতা। কাশীরামের কাছে এখানেই বাঙালীর ঋণ। বাঙালী কাশীরাম দাসকে কৃত্তিবাসের মতোই জাতীয় কবি হিসেবে সাদরে চিহ্নিত করেছে। কৃত্তিবাসের মতো কাশীরামের মৌলিকতা রয়েছে মূলের গ্রহণে বর্জনে। মহাভারতকে লোকায়ত করতে গিয়ে কাশীরাম গুরুভার বহু কিছু যেমন বর্জন করেছেন, তেমনি নতুন কাহিনী সংযোজন করেছেন। পারিজাত হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান—এসব কাহিনী ব্যাসের মহাভারতে নেই।

কাশীদাসী মহাভারত চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙালীসমাজের জীবনরসে পরিপুষ্ট। চৈতন্যদেব যে ভাব, পরিশীলিত রুচি, প্রেম ভক্তির ক্ষেত্র রচনা করেন, কাশীরামের যুগেও তা প্রবল ছিল। অধিকন্তু কাশীরাম দাস বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ী মনটি তাঁর রচনায় সর্বত্র কাজ করেছে। ভক্তিধারায় তাঁর চেতনা প্লাবিত। এই দুই প্রভাবে কাশীদাসী মহাভারত পাণ্ডব-বংশের ইতিহাস না হয়ে বিশেষভাবে কৃষ্ণকথা হয়ে উঠেছে। দুই শূর নায়ক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় নবদূর্বাদল শ্যামরূপে পরিণত হয়েছেন। কাশীদাসী মহাভারতের মৌলিকতার এ আরেক দিক। কাহিনী গ্রন্থনে মহাভারতের বৈশিষ্ট্য গল্পস্বাদ সৃষ্টি—গল্প রচনার বাঁধুনি। সে বাঁধুনি সৃষ্টিতে কাশীরাম দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহাভারতের মতো রাজসভার কাব্যকে বাংলার লোকবৃত্তে আনতে গিয়ে কাশীরাম ভাষার ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ পরিহার করতে পারেন নি। সমাস, সন্ধি ও আলঙ্কারিক ব্যবহারও স্থানে স্থানে বেশি হয়েছে। কিন্তু তাতে মহাভারতের রসস্রোতে কাব্যতৃষ্ণা নিবারণে বাঙালীর অসুবিধা ঘটে নি। বর্ণনার সরসতা ও গতি ব্যাহত হয় নি। রামায়ণে যেমন পারিবারিক মূল্যবোধ বিধৃত, মহাভারতেও অনুরূপ। জীবে দয়া, স্বার্থ ত্যাগের মহিমা, ভ্রাতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বজন প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, লোক শিক্ষার আলো নিয়ে মহাভারতে প্রজ্বলিত।

কৃত্তিবাসের মতো কাশীরাম দাসও মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবর্তন করেছেন। সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করে কাশীরাম দাস তাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করেছেন। আবার তারই মধ্যে পুরাণ বা অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যও নিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল কোথাও তা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে বাংলার জীবনবৃত্তের কাহিনীকাব্য

হয়েছে। পাণ্ডবদের বন গমনের বেশ দেখে মা কুন্তীর কান্না, পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সান্ত্বনা দান—এরকম বহু অংশে কাশীরাম বাঙালীর জীবনবৃত্তকে তুলে ধরেছেন। কুন্তী কাঁদতে কাঁদতে দ্রৌপদীকে বলছেন,—

তুমি সত্যজিতা সতী পতিব্রতা
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন আমার জীবন
তুমি জান ভাল মতে।
সহজে বালক বনে মহাদুঃখ
সবে দেখিবে স্নেহেতে॥

শোকাহত দ্রৌপদী বলছেন,—

....

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে জুড়ি দুই কর।।
উঠ উঠ মহাদেবী না বাড়াও শোক।
কর্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানী লোক॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন॥

যে সব অংশে কাশীরাম মূল মহাভারতের অনুবর্তন করেছেন সে-সব ক্ষেত্রেও বাঙালী পাঠক তাদের জীবনঅঙ্গনে দাঁড়িয়ে রসাস্বাদনে অতৃপ্তি বোধ করে নি। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস যদি মহাভারত ও রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করতেন আমরা ব্যথিত চিত্তে বলতাম, কবিদের মৌলিক প্রতিভার অভাব ঘটেছে। কিন্তু সে দুর্দৈব ঘটে নি। রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বন করে দুই কবি বাঙালীর রামায়ণ, বাঙালীর মহাভারত রচনা করেছেন। রামকথার মতোই ভারতকথা বাঙালীর জীবনাচরন, ধ্যানধারণা জীবনাদর্শের কাব্য হয়ে উঠেছিল। আর এই কৃতিত্বের জন্যই কৃত্তিবাস-কাশীরাম বাংলার জাতীয় কবি—বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কবীর দলে তাঁরা পুণ্যবান।

❖

আরাকান রাজসভার কবি

আরাকান রাজসভায় সাহিত্য সাধনায় নিরত কবিদের মধ্যে কেউ ছিলেন সুফীদর্শনের প্রবক্তা, কেউবা অবলম্বন করেছেন হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা রোমান্টিক কাহিনী। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ও আঙ্গিক তাঁদের আয়ত্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু-পুরাণ সম্বন্ধে ছিল সুস্পষ্ট ধারণা। আরবী শব্দের প্রয়োগে ও মুসলমান সমাজজীবনের অনুষঙ্গে তাঁরা যে কাব্য রচনা করেছেন বিষয়বৈশিষ্ট্যে এবং ভাবের গভীরতায় সেই কাব্যসম্ভার মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের অসামান্য সম্পদ-রূপে পরিগণিত হয়েছে।

ক. দৌলত কাজী॥

দারুন পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার
এক যায় আন আসে কেহ নাহি কার।

কবি-পরিচয়॥

চট্টগ্রামের সুলতানপুরে কবির জন্ম। জন্মকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক বলে অনুমিত। কবি তরুণ বয়সে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। স্বগ্রামে আশানুরূপ কোন সমাদর তিনি পান নি। যশপ্রার্থী দৌলত তাই চট্টগ্রাম থেকে চলে আসেন আরাকান রাজদরবারে। রাজার সমরসচিব আশরাফ খানের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে হিন্দী কবি মিয়া সাধনের 'মৈ না কো সত' হিন্দী কাব্য অবলম্বনে দৌলত রচনা করেন 'লোর চন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়না' কাব্য। কাব্য রচনা অসমাপ্ত রেখে কবি মারা যান।

দৌলত কাজীর কাব্য ও কবিপ্রতিভা॥

'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী: গোহারি দেশের রাজা মোহরার সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণী। এক নপুংসক বামনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। দাম্পত্য

জীবনে অসুখী চন্দ্রাণী অতঃপর আকৃষ্ট হন রাজা লোরকের প্রতি। লোরক তার প্রথমা পত্নী ময়নাকে পরিত্যাগ করে চন্দ্রাণীকে নিয়ে দেশান্তরী হন। পথে চন্দ্রাণীর প্রথম স্বামী নপুংসককে নিহত করেন। পরে রাজা মোহরার অনুরোধে লোরক গোহারির রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

নূতন রাজসুখে মগ্ন রাজা লোরক ততদিনে বিস্মৃত হয়েছেন পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী ময়নাকে। স্বামীহীনা পুত্রহীনা ময়নার দুর্গতি চরমে ওঠে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে কুটিনী রত্না লম্পট রাজকুমার ছাতনের কুপ্রস্তাব নিয়ে এলো ময়নার কাছে। নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে চাইল তাকে। দৃঢ়চিত্ত সচ্চরিত্রা ময়না বারংবার প্রত্যাখ্যান করল সে প্রস্তাব। এভাবে সে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর হল তার সতীত্বের গৌরব। পতিব্রতা ময়নার সতীত্বের গৌরব বর্ণিত হয়েছে বলে কাব্যটির অপর নাম '**সতী ময়না**'।

রত্না বর্ণিত সুখের বারোমাস্যার জ্যৈষ্ঠমাস অবধি বর্ণনা করে কাব্য অসমাপ্ত রেখে দৌলতকাজী মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাব্যকে সম্পূর্ণ করেন কবি আলাওল। 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের উৎস প্রাচীন হিন্দী ভাষায় রচিত লোরক-মৈনা-চন্দ্রায়ণী বিষয়ক লোকগাথা। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ লোর চন্দ্রাণী বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রচলিত দৈব অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত এ কাব্য মর্ত্য-লোকের মানবিক জীবনরসের আলেখ্য। চন্দ্রাণীর যৌবনোচ্ছল প্রেম, লোরের বীরত্ব এবং তাদের দাম্পত্য জীবনে মানব মানবীর চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতি-ফলিত হয়েছে। সর্বোপরি আছে ময়নার নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব গৌরব। যথার্থ প্রেমের অগ্নিশুদ্ধ আলোক ময়নাকে সর্ব প্রকার প্রলোভনকে জয় করার শক্তি দিয়েছে। দিয়েছে দুঃসহ দুঃখবরণের দুঃসাহস।

কুটিনী রত্না, কিম্বা দুশ্চরিত্র ছাতন ও নপুংসক বামন চরিত্র অঙ্কনেও তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় মুসলমান হয়েও দৌলত হিন্দুসমাজ ও হিন্দুপুরাণের বহু বিষয় সবিস্তারে নিঁখুত ভাবে বর্ণনায় দক্ষ এক কাব্যশিল্পী।

দৌলতের মর্ত্যচেতনার মরমী সুর ফুটে উঠেছে মাটির জয়গানে :

সিদ্ধিপদ পুণ্যপদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব।
মাটি হস্তে রত্নমণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা॥

সুফী সাধক কবির সাধনতত্ত্ব এইসব কাব্যাংশে প্রচ্ছন্ন আছে ঠিকই কিন্তু আপাত-উদ্দিষ্ট যে মাটি ও মানুষ—তার মহিমা মূর্ত হয়েছে কাব্যের চরণে চরণে। মর্ত্য-জীবনের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শে সমুজ্জ্বল এ কাব্যের রচয়িতা মূলত মর্ত্যপ্রেমিক। মানুষের প্রতি গভীর মমতায় তিনি উদ্দীপ্ত।

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কেতাব কোরাণ
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥

কবি জয়দেবের সুললিত ছন্দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব দৌলতও এড়িয়ে যেতে পারেননি। 'নবচ্যূত অঙ্কুর / কিশলয় মঞ্জুল / রঞ্জিত তরুলতাপুঞ্জে' প্রভৃতি স্পষ্টতই জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু জয়দেব এ ছন্দে করেছেন ঈশ্বর বন্দনা। আর দৌলত এ ছন্দে মূর্ত করেছেন মানুষের প্রেমলীলা। দৌলত কাজীর বহু কাব্যোক্তি গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। দুই একটি শব্দের ইঙ্গিতে তিনি মানব প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্যকে প্রকাশিত করেছেন। 'যুবক পুরুসজাতি নিষ্ঠুর, দুরন্ত। এক পুষ্পে নাহি জান মধুকর শান্ত॥' কিংবা, 'মন বিনা তনু যেন মৃত্তিকা পিঞ্জর।' এ রকম তীক্ষ্ণ সুন্দর ইঙ্গিতবহ বাক্য অনেক রয়েছে তাঁর কাব্যে।

খ. সৈয়দ আলাওল॥

প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর।

কবি পরিচয়

আরাকান রাজসভার দ্বিতীয় সাহিত্যরত্ন সৈয়দ আলাওল। গবেষক পণ্ডিত ডঃ শহীদুল্লাহর মতে আলাওলের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং মৃত্যু হয়

১৬৭৩খ্রীষ্টাব্দে। জন্মস্থান ফতেহাবাদ গ্রামে, ফরিদপুর জেলায়। আরাকান রাজের সেনাবিভাগে যোগদান করেন ভাগ্যবিড়ম্বিত আলাওল। এই সৈনিক কবি সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ক্রমে আরাকানের মুসলমান সমাজে তিনি 'তালিব আলিম' (সুপণ্ডিত) আখ্যায় বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। আরাকান রাজের প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান এবং রাজসুহৃদ সৈয়দ মুসা প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওলের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশের পথ প্রশস্ততর হয়।

কাব্য পরিচয় ও কবি প্রতিভা ॥

লোর চন্দ্রাণী ঃ মন্ত্রিবর সুলেমানের নির্দেশে দৌলতকাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোরচন্দ্রাণী' সম্পূর্ণ করেন আলাওল। সংযোজিত অংশে লোরকের পরিত্যক্তা পত্নী ময়নার বিরহ দুঃখ লাঘবের জন্য ময়নার সখী একটি রূপকথার অবতারণা করেন। এই রূপকথার রাজা উপেন্দ্রদেবও স্ত্রী রতনকলিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। রতন-কলির পুত্র আনন্দ বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পিতার সঙ্গে মিলিত হয়। দীর্ঘকাল পরে রতনকলি হৃত স্বামীকে ফিরে পান। অনুরূপভাবে চন্দ্রাণীর পুত্র প্রচণ্ডতপনও বহু বিপদ জয় করে। রাজা লোরক এক সারিকা পক্ষীর নিকট ময়নার কথা শ্রবণ করে অনুতপ্ত হন ও ময়নার সঙ্গে লোরকের শেষ পর্যন্ত মিলন হয়। যথাকালে লোরকের মৃত্যু হলে তাঁর দুই পত্নী তাঁর সঙ্গে সহমরণে যান।

দৌলত কাজীর সুরচিত প্রথমাংশের তুলনায় আলাওল রচিত শেষাংশ নিতান্তই নিষ্প্রভ, নীরস। ঘটনার বাহুল্যে ও জটিল শাখা-প্রশাখায় কাহিনীর স্বাভাবিক গতি হারিয়ে গেছে। দৌলতের ছন্দনৈপুণ্য কিংবা গ্রন্থন সৌকর্য এই অংশে অনুপস্থিত।

পদ্মাবতী ঃ পদ্মাবতী'ই' আলাওলের মুখ্য রচনা। মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ এই পদ্মাবতী।

চিতোরের রাণা রত্নসেন ও সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। বহু পল্লবিত উপকাহিনীতে এ কাব্য পূর্ণ। পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যের কথা শুনে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট রাণা রত্নসেন বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পদ্মাবতীকে লাভ করেন। তাঁর প্রথমা মহিষী নাগমতী এবং নবলব্ধা পদ্মাবতীকে নিয়ে মহানন্দে রাজ্যভোগ করছেন তিনি। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ জাদুকরের

আবির্ভাব হল। তারই চক্রান্তে দিল্লীর সুলতানের কানে পৌছাল পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যের সংবাদ। সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীর প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন। অধিকারও করলেন। কিন্তু ইত্যবসরে নাগমতী এবং পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হয়েছেন। সেনাদলের অগণিত শব, অগ্নিদগ্ধ নারীকঙ্কাল ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দুর্গ—এইমাত্র লাভ হল বিজয়ী সুলতানের।

এই কাহিনীর গ্রন্থনায় লোককথা-রূপকথার আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে। নানা রূপকের ছলে সুফীবাদের অধ্যাত্মলোক উদ্ঘাটনই আলাওলের মূল লক্ষ্য। তৎসত্ত্বেও কাব্যের বহিরঙ্গের বিচারে পদ্মাবতী একটি চমৎকার মানবীয় প্রেমের নিদর্শন হয়ে আছে।

> প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
> ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥
> যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
> মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥

এই প্রেমতত্ত্ব সুফী ভাবাদর্শের কাব্যরূপ। কিন্তু নারীর রূপ বর্ণনায় আলাওল সম্পূর্ণ মানবিক।

> অলকের গুঞ্জা ডোলে কপোল উপরি।
> হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি ॥
> কাঁচলী আবৃত স্তন পাশা যুগ্ম সারি।
> সুন্দর অঞ্চল ঢাল মন লয় কাড়ি ॥

এই বর্ণনায় পাঠক পায় মানবীর রূপৈশ্বর্য। মানবীয় প্রেমচেতনাই পদ্মাবতী কাব্যের যুগজয়ী সম্পদ। এ প্রেম মিলনে আনে অপূর্ব সুখ, বিরহে জাগিয়ে তোলে দুঃসহ বিষাদ।

সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল ঃ মাগন ঠাকুরের নির্দেশে রচিত এ কাব্যের আখ্যানে কবির ব্যক্তিগত জীবনের নানা নিগ্রহের অভিজ্ঞতা বিজড়িত। আরব্য-উপন্যাস 'আলিফ লায়লা' থেকে গৃহীত হয়েছে এর কাহিনী। মিশরের বাদশাহ সয়ফুলমুলুক পরীকন্যা বদিউজ্জমালের প্রেম ও পরিণয় এর বিষয়। পার্থিব নরনারীর

রোমান্টিক প্রেমনির্ভর এই কাব্যে কবিকল্পনার স্বতস্ফূর্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সপ্ত পয়কর : আলাওলের এই কাব্য একই রীতিতে রচিত প্রেমকাহিনী।

তোহ্ফা : আরবী গ্রন্থ 'তুহ্ফাতুন্নসা' গ্রন্থের এই অনুবাদ ধর্ম, আচারবিষয়ক নীতিবাক্যে সমাকীর্ণ। কাব্য হিসেবে এর স্থান গৌরবময় নয়।

সেকেন্দার নামা' : আলেকজাণ্ডারের বিজয় কাহিনী বিষয়ক এই কাব্যে ইতিহাস, অতিরঞ্জন, রূপকথা পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আলাওলের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে দুজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় :

'বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সেযুগে আর কেহই ছিলেন না।'
[ডাঃ শহীদুল্লাহ্।]

সৈয়দ মুর্তজা আলি মন্তব্য করেছেন : 'তাঁর পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নূতন রূপ লাভ করে।...তাঁর রচনায় ছিল কবিপ্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর।'

আলাওল শক্তিশালী কবি, কিন্তু দৌলতকাজীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় আলাওলের প্রতিভা ব্যাপক, কিন্তু দৌলতকাজীর প্রতিভা গভীর। তবে এই দুই প্রতিভার ঐতিহ্যের সুকৃতি হলো—এঁদের সৃষ্টিকর্ম সম্প্রদায়ের সীমা লঙ্ঘন করতে পেরেছে। মানবাগ্রহে ও মত্যপ্রীতিতে কাব্যকে পূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন এই দুই কবি।

❋

ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য।

—রবীন্দ্রনাথ

কবি পরিচয় ॥

মধ্যযুগের বিদগ্ধ শাক্ত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জন্ম আনুমানিক ১৭১২ সাল। ভাগ্য-তাড়নায় বহু স্থান পরিভ্রমণ করে এবং বহু বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভারতচন্দ্র শেষপর্যন্ত কৃষ্ণনগরের মহারাজার সভাসদ কবি হন। 'অন্নদামঙ্গল' সভাকবি ভারত-চন্দ্রের রচনা। স্বভাবতই রাজানুগ্রহ এবং রাজরোষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছায়া-পাত ঘটেছে তাঁর কাব্যের নানা স্থানে। ১৭৬০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম জীবনে যেমন নানা দুর্ভোগে তিনি জীবন কাটিয়েছেন শেষ জীবনে তেমনি লাভ করেছেন স্বীকৃতি ও সম্মান। মহারাজ তাঁকে দিয়েছেন মাসিক ৪০ টাকা বেতন, প্রচুর জায়গীর এবং কবিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'গুণাকর' উপাধি। ৪৮ বছর বয়সে কবি দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের যুগপরিবেশ ॥

শাক্তপদাবলী আলোচনায় অষ্টাদশ শতকের সমাজপটভূমির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ বাংলার নৈতিক সংকটের কাল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক অবক্ষয়—উভয় সংকটে আবর্তিত সমকালীন বাঙালীর সমাজজীবন। এক সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তা গোটা সমাজকে যেন গ্রাস করতে উদ্যত। সেই দুঃসময়ের সাক্ষ্য বহন করে পরিবর্ধিত হয়েছে ভারতচন্দ্রের কবিসত্তা। মানুষের মন থেকে অবলুপ্ত হয়েছে আত্মবিশ্বাস, শঠতা ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতেছে রাজদরবার ও অভিজাত সম্প্রদায়। নৈতিক আদর্শভ্রষ্ট কুলীনকুল। পরম্পরাগত দেববিশ্বাস শিথিল। কৃষ্ণনগরের দরবারি সংস্কৃতিতে বিলাসবাহুল্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগসর্বস্বতা

সভাকবির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। সস্তা চটুলতা, কামাচার, বর্ণনার বাহুল্য বুঝি একারণেই এসেছে তাঁর কাব্যে। দেব-দেবীর জীবন নিয়ে যথেচ্ছ কৌতুক করতেও তাঁর বাধেনি। এতে পৌরাণিক সংস্কার আহত হলেও সমকালীন সমাজ ও জীবনের একটি বিশ্বস্ত চিত্র এখানে সুস্পষ্ট।

ভারতচন্দ্রের কাব্য ও কবিপ্রতিভা ॥

ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক রচনা দু'খানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী। বিবিধ বিষয় নিয়ে ছোট ছোট কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। রসমঞ্জরী নামে একখানা অনুবাদ গ্রন্থও লেখেন।

কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের জন্যই ভারতচন্দ্রের যুগপ্রসিদ্ধি। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত ; যথা (১) অন্নদামঙ্গল, (২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (৩) মানসিংহ। কাহিনীগুলির পারস্পরিক যোগসূত্র ক্ষীণমাত্র। অন্নদার দেবী-মাহাত্ম্য সব খণ্ডেই বর্ণিত হয়েছে বলেই এগুলি অভিন্নগ্রন্থরূপে গণ্য হয়েছে।
অন্নদামঙ্গলে পৌরাণিক আখ্যান অনুসরণে শিব-সতীর বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ,, মদনভস্ম প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত। ঈর্ষান্বিত ব্যাসমুনির লাঞ্ছনা, হরিহোড়ের দারিদ্র্য দশা থেকে মুক্তিলাভ, শাপগ্রস্ত দেবতা ভবানন্দ মজুমদারের মর্ত্যলীলা—প্রভৃতি বিভিন্ন কাহিনীতে প্রচারিত ও প্রমাণিত হয়েছে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য। 'বিদ্যাসুন্দর' বর্ধমান রাজকন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চী রাজপুত্র সুন্দরের গোপন প্রণয়-কাহিনী। ধৃত ও অভিযুক্ত সুন্দর বধ্যভূমিতে কালিকার স্তবগানে দেবীকে তুষ্ট করেন। দেবীর অনুগ্রহেই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি ও বিদ্যাকে লাভ করতে সমর্থ হন। তৃতীয় খণ্ডে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, মানসিংহ ও ভবানন্দের কাহিনী। ভবানন্দের বন্দীদশা ও দেবীকৃপায় মুক্তি এর প্রতিপাদ্য।

'অন্নদামঙ্গল'—নামকরণ থেকে মঙ্গলকাব্য বলে চিহ্নিত হলেও মঙ্গলকাব্যের বাঞ্ছিত লক্ষ্য একাব্যে রক্ষিত হয়নি। একাব্য বহুজন হিতায় নয়—একাব্যের পাঠক নির্বাচিত বিদগ্ধজন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ-পরিবেশও এখানে অনুপস্থিত। মঙ্গলকাব্যে মানবিক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসানুভূতির যে প্রবলতা দেখা যায় অন্নদামঙ্গল তা থেকেও অনেকাংশে মুক্ত। মঙ্গলকাব্যের ভাব ও রীতিবিরুদ্ধ

এক নূতন মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র স্বকীয় কবিপ্রতিভা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। মার্জিত কাব্যরুচির মানদণ্ডে অন্নদামঙ্গলের বহু অংশই স্থূলতা ও অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এযুগে শিথিল রুচিই ছিল অনেকাংশে সামাজিক বাস্তবতা। রাজ-মনোরঞ্জনের প্রবল প্রয়োজনে কবির নিজস্ব রুচিবোধ অবশ্যই খর্ব হয়ে থাকবে। ভারতচন্দ্রের সাফল্য কবিদৃষ্টির স্বচ্ছতায়, সমাজের বাস্তব চিত্র পরিস্ফুটনে, নীতিহীনতার প্রতি তীব্র কটাক্ষে, অধঃপতনের কঠোর সমালোচনায়। হর-পার্বতীর সাংসারিক দারিদ্র্য, নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধের বিড়ম্বিত দাম্পত্য, যুদ্ধাভিযান প্রভৃতি বর্ণনার গুণে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। নিস্পৃহ বাস্তববোধের ফলে কাব্যের দেবতা মর্ত্যের মানুষ হয়ে উঠেছে। লঘুহাস্য-পরিহাস বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। অসঙ্গতি, কৌতুক কবির চমকপ্রদ বাগ্‌ভঙ্গীতে বড় উপভোগ্য। 'আহা আহা হরি হরি। 'উহু উহু মরি মরি'। 'হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই', প্রভৃতি তার উদাহরণ। শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য, অনুপ্রাস-অলংকার বিদ্যুৎদীপ্তির মতো উদ্ভাসিত করেছে তাঁর কাব্যকে। সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় বাহিত করা তাঁর কৃতিত্ব।

> ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
> যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
> প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
> ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥

এইসব অংশের শব্দৈশ্বর্য ও ছন্দবৈচিত্র লক্ষ্য করার মত। অনুরূপ ধ্বনিতরঙ্গ তিনি বহু অংশেই সৃষ্টি করেছেন অবলীলায়। ভারতচন্দ্রের ছন্দ বিচিত্র উদ্দাম, ভাষা কল্লোলিত। বীভৎসতা ও কৌতুক শতধারে বর্ষিত হয়েছে কাব্যের নানাস্থানে। আহারে নিরত শিবের বালকসুলভ আনন্দ তাঁর দেবচরিত্র অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রকেই প্রকাশ করে। ভারতচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্ররা নিষ্ঠাবান ভক্ত বা ধীরোদাত্ত নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নন, তাঁরা প্রায়শই ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত এবং বিকৃত স্বভাব। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী উদ্ভাবনে তাঁর মৌলিকতা নেই, কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে, ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগে এবং চরিত্রাঙ্কনের অভিনবত্বে অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের একান্ত স্বকীয় কাব্যকৃতি হয়ে সাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

ছন্দের অধীশ্বর ভারতচন্দ্রের অপূর্ব বাক্‌রীতি বহু রসোত্তীর্ণ প্রবচনের জন্ম দিয়েছে :

১. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
২. সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর
৩. যার কর্মে যারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
৪. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন
৫. মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়

ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা ॥

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের শিথিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগে বাংলার সুবেদারগণ যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। দরবার, হারেম এবং অমাত্যদের আবাস ষড়যন্ত্র ও স্বার্থশিকারের কেন্দ্র হয়ে উঠল। তার প্রতিক্রিয়ায় অনাচার ও দারিদ্র্য হল জনসাধারণের নিত্যসঙ্গী। চৈতন্য আন্দোলনের প্রগতিশীলতা ও প্রাণশক্তি ক্রমে নিঃশেষিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের স্থলে সংশয় ও আচার-সর্বস্বতা দেখা দিল। প্রচলিত মূল্যবোধগুলি হয়ে পড়ল অর্থহীন। মধ্যযুগের এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়কে ভারতচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মনীষা দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে। তাঁর কাব্যে তাই জীর্ণ পুরাতন আদর্শ ও প্রথা অস্বীকৃত হয়েছে, বিদ্ধ হয়েছে তীব্র ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে। এই ভাঙ্গনের উপর কবি গড়তে চেয়েছেন নূতন আদর্শ, নূতন মূল্যবোধ। এখানে তাঁর মন আধুনিক। প্রাক্‌ ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যে মানুষ ছিল দেবতার অধীন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই প্রথম দেবতা হল মানুষের অধীন। হরিহোড় দেবী অন্নদাকে একের পর এক শর্তে বেঁধেছে। অনাহার ক্লিষ্ট বঙ্গবাসিনী এক বৃদ্ধার বেশে দেবীকে মর্ত্যে নামিয়েছেন ভারতচন্দ্র। মর্ত্যমমতাময় জীবনচেতনার প্রকাশ অন্নদামঙ্গলের সর্বত্র। এই সূত্রেই তাঁর কাব্যে বিলাসকলা এসেছে, ভোগদর্শন এসেছে। বিদেশী ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন। নব্যমানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মুক্ত-প্রেমের উদারতায় মানুষকে দেখার দৃষ্টি তিনি এই যোগসূত্রেই লাভ করে থাকবেন। 'মানসিংহ' খণ্ডে মানুষের ইতিহাসকে তিনি কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করে আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে যে মানবমূল্যবোধ বাংলায় নবজাগরণের সৃষ্টি

করেছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার পদধ্বনি শোনা গেছে। আগত যুগের পদধ্বনি ভারতচন্দ্র শুনেছিলেন, তাকে সবলে স্বপ্রতিভায় প্রতিধ্বনিত করেছিলেন তাঁর কাব্যে। এইখানেই ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা। এইখানেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা ঘটেছে।

এই আধুনিকতা কাব্যের অঙ্গসজ্জায়ও এসেছে। সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার, শব্দচয়ন ও প্রয়োগ, কথায় হীরার ধার, তীক্ষ্ণ হ্রস্ব মন্তব্য, হাস্যরসবোধ অন্নদামঙ্গলকে যথার্থ রাজকণ্ঠের মণিমালা করে তুলেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই ঔজ্জ্বল্য আধুনিকতার পথ রচনা করেছে।

শাক্তপদাবলী

'অষ্টাদশ শতকে শাক্তপদের এক মহৎ ধারা প্রকাশিত হইল। উহার দুইটি রূপ আছে—একটি গার্হস্থ্যরূপ : তাহাতে উমারূপে বাঙালী ঘরের কন্যার মত শক্তিদেবী তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া স্নেহের, মমতার ও বিদায়-বেদনার তরঙ্গে সকলকে ভাসাইয়া যান।...... দ্বিতীয়টি সাধনরূপ : ইহাতে তন্ত্রের মহাশক্তি মুক্তিদায়িনী শ্যামা জননীরূপে সন্তানের ভক্তি অভিমানের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন।

—গোপাল হালদার (বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা)

শাক্ত পদাবলীর সমাজ পটভূমি ॥

বাঙালীর শক্তিসাধনার প্রেক্ষাপট নৈরাশ্যের ও নিরুৎসাহের। উপর্যুপরি বর্গীর হাঙ্গামায় আতঙ্কিত বাংলার জনজীবন। জীবনে নিরাপত্তা নেই, মনে শান্তি নেই। ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হলো। তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে ইংরেজ বণিক ও দেশীয় প্রভুদের লোভ ও লোলুপতায় বাংলার গৃহ-সংসারে ও সমাজজীবনে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার। ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভের আকাজ্ক্ষায় ভয়ঙ্করের সাধনা ; নৈরাশ্যে আশ্রয়লাভের জন্য মাতৃক্রোড়ের বাসনা। অষ্টাদশ শতক জুড়ে চলেছে রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতা, উচ্ছৃঙ্খল শাসকের দুরাচার। অন্যদিকে ধর্মবোধ ও মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা বাঙালীকে অন্তরে-বাইরে নিঃস্ব করে দিল। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে বাঙালী আশ্রয় খুঁজেছে শক্তিদেবতার। মানুষের পরাভবের দিনে আবির্ভূত হয়েছে দেবতা। বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ-লীলামাধুরীর পর্ব শেষ। এখন স্নেহকাতর, ভয়বিহ্বল সন্তানের অভয় ও আশ্রয়দায়িনী মাতৃকামনার পর্ব। বাঙালীর এই মাতৃসাধনায় শক্তিদেবী রক্তনয়না, নৃমুণ্ডমালিনী কালিকার মূর্তিতে আরাধ্যা ও পূজিতা। মদ্যে মাংসে পরিতুষ্টা এই ভয়ংকরী দেবী তন্ত্র সাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। মুক্তিকামী অত্যাচারিত জনসমাজ

এই শক্তিরূপার চরণে ভক্তি অভিমানের অর্ঘ্য দিয়ে অভয় কামনায় আকুল হয়েছে। আবার গিরিবালা উমাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে শাক্তগীতি যা স্নেহধারায় সিক্ত বাঙালীর গার্হস্থ্যগীতির নামান্তর। আগমনী ও বিজয়াগীতি এই পর্যায়ের শাক্তপদ। এখানে আরাধ্যা দেবী শ্যামা জননী নন, এখানে তিনি কন্যা উমা। বিবাহিতা উমা কন্যার পিত্রালয়ে বৎসরান্তে শারদীয় উৎসবে আগমন নিয়ে আগমনী গান; আর মাত্র চারটা দিন কাটিয়ে পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার বেদনার গান বিজয়া গান। শক্তিসাধকের গুহ্যমন্ত্রের পরিবর্তে এখানে উচ্চারিত হয়েছে বাৎসল্যের অশ্রুলিপ্ত ভাবাবেগ। পীড়িত জনসমাজ এভাবেই বুঝি গার্হস্থ্য-জীবনের শান্তির শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত সেই শূন্যতা পূরণের তৃপ্তিগীতি রচনা করেছেন।

ক. রামপ্রসাদ ॥

কবি-পরিচয়

মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। ১৭২০-২১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ২৪ পরগণার হালিশহরে তিনি জন্মগ্রহন করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। রামপ্রসাদের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের ঘটনা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম জীবনে ধনাঢ্য ভূস্বামীর মুহ্‌রীগিরি করেছেন রামপ্রসাদ।

প্রভুর টাকা-পয়সা আয় ব্যয়ের হিসাবের খাতায় লিখেছিলেন: 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' সেই লেখা দেখে প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন না, উপরন্তু মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে রামপ্রসাদের ভক্তিপ্রাণতাকে সম্মানিত করেছিলেন। স্বয়ং কালিকা দেবী তাঁর কন্যার বেশে তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন। দেবী অন্নপূর্ণা তাঁর গান শোনার জন্য কাশী থেকে এসে হাজির হয়েছিলেন কবির চণ্ডী-মণ্ডপে। এরূপ অসংখ্য জনশ্রুতিতে আকীর্ণ হয়ে আছে রামপ্রসাদের জীবন।

রামপ্রসাদের পদাবলী ও কবি-প্রতিভা ॥

রামপ্রসাদের গান সংখ্যায় প্রায় তিনশ'। এই গানে চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। ১। উমাবিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), ২। সাধন বিষয়ক, ৩। দেবীর বিরাট স্বরূপ বিষয়ক, ৪। তত্ত্বদর্শন ও নীতিবিষয়ক। এছাড়া তিনি 'কালীকীর্তন' ও

'কৃষ্ণকীর্তন' নামে দুখানা ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করেন।

শ্যামাভক্ত রামপ্রসাদ প্রধানত আধ্যাত্মিকতার কবি। মাতৃজ্ঞানে তিনি আরাধ্যা দেবীকে নিবেদন করেছেন অকপট হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য। শিশুসুলভ সারল্যে আবদার-অনুযোগে অভিমান-তিরস্কার জ্ঞাপন করেছেন জননীর নিকট। বস্তুত, তাঁর কবিত্ব ও মাতৃভক্তি একাকার হয়ে এক অভূতপূর্ব কাব্য-সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছিল।

মূলত সাধনতত্ত্বের প্রকাশেই নিবিষ্ট ছিলেন তিনি, কাব্য নির্মাণের সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের প্রতি অনুরাগ সামান্যই ছিল তাঁর।

১. হৃৎ কমল মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা ॥……

২. আমার মনের বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্ম রন্ধ্রে সহস্রারে হল ক্ষ ব্রহ্মরূপিনী ॥……

ইত্যাদি সঙ্গীতের বাণী যতই জনপ্রিয় হয়ে থাক না কেন এগুলির কাব্যসৌন্দর্য নগণ্য। নিতান্ত তত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধিতে ভারাক্রান্ত এইসব কাব্যগীতির প্রধান আবেদন উৎসুক সাধক চিত্তে, কাব্যপিপাসু পাঠক হৃদয়ে নয়।

রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে, যেখানে তিনি দুঃখ নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন ; ভক্তের আকুতি যেখানে সংসার জীবনের হাহাকার হয়ে বেজেছে।

১. মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥……

২. আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
দুখে দুখে জনম গেল আর কত দুখ দাও দেখি-তাই ॥

৩. আমি এই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।

৪. মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারাদিনটা গেল ॥

ইত্যাদি পদে ভক্তির নামাবলীতে সংসারজীবনের দৈন্যই প্রকট হয়েছে। দুঃখ-

দারিদ্র্যে পীড়িত বাঙালী জনসমাজ যেন পরিত্রাণের পথ খুঁজে না পেয়ে এমনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে। তারা কল্পনা করেছে অদৃষ্ট নিয়ন্তা দেবী জননীর। তাঁরই কাছে ব্যক্ত করেছে তীব্র অভিমান। বাস্তব সংসারে যন্ত্রণা সমাধানের পথ যখন খুঁজে পাওয়া যায় না তখন চিন্তা-চেতনায় দেব অনুগ্রহের উপর নির্ভরতাই প্রাধান্য পায়। দীন ভক্ত এবং দরিদ্র ভিক্ষুক উভয়েরই নিকট রামপ্রসাদী গানের সমান সমাদর বোধকরি এ কারণেই। রামপ্রসাদের কৃতিত্ব তিনি কল্পিত শ্যামা জননীকে কল্পনার দূরত্ব থেকে নিয়ে এসেছেন সংসারের অঙ্গনে।

আদ্যাশক্তির সঙ্গে তাঁর মান-অভিমানের সম্পর্ক, মা সন্তানের সম্পর্ক, মায়ের চরণ তাঁর আশাহীন হৃদয়ের ভরসাস্থল। আর মা-ও যেন প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর স্নেহধারায় মুছিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন পীড়িত সন্তানের সর্বদুঃখ-সন্তাপ। জীবনের ঘোলা গঙ্গাজলে তত্ত্ব মিশে গেছে। তত্ত্বে-বাস্তবে, মাতৃত্বে-মাটিতে একাকার। বৈষ্ণবপদাবলী বৈকুণ্ঠের গান ; রামপ্রসাদী পদাবলী সংসারের সঙ্গীত। সংসারের 'অশ্রুরচিত হার' এই সঙ্গীতের আগমনী থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—,

ওগো রাণি নগরে কোলাহল, উঠ, চলচল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এস না সঙ্গে আমার গো।।
... ...
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ নিরখি বদন উমার।
বলে, মা এলে, মা এলে, মা কি ভুলে ছিলে ;
মা বলে এ'কি কথা মা'র গো।।

বাঙালীর জীবনে মিলন বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট এই গান।

গীতমাধুর্যে ও মর্মস্পর্শী আবেদনে প্রসাদী সঙ্গীত সমকালীন যুগে এক বৃহৎ জনমণ্ডলীকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। যুগপৎ অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস এবং মাতৃমমতার আশ্বাস নিয়ে তৃষাতুর বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন তুলেছিল সাধক কবির কাব্যগীতাগুলি। জীবন চিত্রণের এই নিষ্ঠায় সাধক কবি আজও আদৃত।

খ. কমলাকান্ত ॥

ভাল হল এলে তুমি আর না পাঠাব আমি
বুঝি বিধি প্রসন্ন হৈলা গো।
আপনার অঞ্চলে রাণী মুছায়ে চাঁদ মুখখানি
প্রাণ উমা কোলেতে লইল গো ॥

কবি পরিচয় ॥

কমলাকান্তের জীবনীকার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন কবি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বর্ধমান জেলার কালনায় অম্বিকানগরে কবির বসতি ছিল। স্থানীয় টোলে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পিতৃবিয়োগের পর চলে আসেন বর্ধমানের চান্নাগ্রামে মাতুলালয়ে। এখানে বাসুলী মন্দিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন বলে জনশ্রুতি। কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর জীবনকাহিনী অলৌকিকতার বর্ণে বহু রঞ্জিত। দেবী কালিকা বাগ্দিনী বেশে তাঁকে মাছ দিয়েছেন, তাঁর মুখে কালীকীর্তন শুনে দুর্দান্ত দস্যুদলের ভাবান্তর হয়েছিল। এইসব অতিরঞ্জনের কারণ বোধ করি কমলাকান্ত রচিত ও সুগীত শাক্তপদাবলীর অসামান্য জনপ্রিয়তা।

কমলাকান্তের পদাবলী ও কবি প্রতিভা ॥

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশ' পদ পাওয়া গিয়েছে। কবি প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার বই বাংলা কবিতায় রচনা করেন। রামপ্রসাদের মত কমলাকান্ত মূলত ধর্মতত্ত্ব নিয়েই পদরচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো সাধনপদ কাব্যগুণেও উৎকৃষ্ট।

মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দ সাগর উথলে ॥

ভাবের গভীরতাকে ছাপিয়ে উঠেছে রূপ-বৈচিত্র্য। কমলাকান্তের শিল্পীমন বহু সূক্ষ্ম কল্পচিত্রে সুসজ্জিত করেছে কাব্যকে। 'সদানন্দ তুমি কালী মহাকালের মন-মোহিনী।' কিংবা 'শুকনা তরু মঞ্জুরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।' প্রভৃতি গীতাংশে একজন সুদক্ষ শিল্পীর কাব্যকর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিন্তু কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর আগমনী ও বিজয়া গানে। মানবিক রসে এই গানগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

বাৎসল্য রসসিক্ত দুর্গার কন্যামূর্তি প্রতিভাত হয়েছে এইসব পদে। বাঙালী কন্যার পিতৃগৃহে আগমন ও স্বল্পকাল অবস্থানের পরে বিদায় গ্রহণের করুণ-মধুর আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে এই গানগুলিতে। সমাজজীবনে কন্যা বড়ো পীড়িতা। সেই গভীর মনোবেদনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে। দারিদ্র্যগ্রস্ত স্বামীগৃহে কন্যার দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার প্রতিরূপ শিবঠাকুরের অনটনক্লিষ্ট দাম্পত্য জীবন! শ্বশুরালয়ে মন্দভাগ্য মেয়ের দুঃখের কথা স্মরণে বাঙালীমায়ের অশ্রুবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বৎসরান্তে একবার সাক্ষাৎলাভের জন্য আজো উৎকণ্ঠিত হয় বঙ্গজননীর হৃদয়। মিলনের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। মাত্র তিনটি দিন। তার পরেই আসবে দশমী—বিজয়ার বিষণ্ণ বিদায় লগ্ন তাই মেনকা কামনা করেন নবমীর নিশিকাল দীর্ঘতর হোক, বিলম্বিত হোক বিদায়ের বেলা। তাঁর আকুল প্রার্থনা: 'ওরে নবমী নিশি, না হৈও রে অবসান।' বিদায় মুহূর্তের চিত্রটিও মর্মস্পর্শী:

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো...।

এমন অশ্রুরচিত সঙ্গীতহার রচনা করে কমলাকান্ত মিলন বিচ্ছেদের রসপুষ্ট প্রত্যক্ষ বঙ্গজীবনকে আকুল করে তুলেছেন। জীবনের এই একান্ত চিত্রণে কমলাকান্তের পদ বাঙালীর রসানুভূতির সম্পদ হয়ে রয়েছে।

বাউল

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।

[লালন]

বাউল গীতির অসাম্প্রদায়িকতা ॥

বাউল বাংলার ধর্মীয় উদারতার জয়গান। বাউল সাম্প্রদায়িক মিলনের স্মারক। যে ধর্মদ্বন্দ্বে বাংলার সমাজজীবন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল মানুষের মনোজগৎ, তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল বাউলের কণ্ঠে।

বাতুল, ব্যাকুল, আউল প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দকে 'বাউল' শব্দের উৎস বলে ধরা হয়। ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা বাস্তববুদ্ধি রহিত এক ভক্ত সম্প্রদায় বাউল নামে অভিহিত। বৈষ্ণব সহজিয়াভাব, মুসলিম সুফীদর্শন, শৈব নাথপন্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্মের সমন্বয়ে বাউল সম্প্রদায় বিস্ময়কর এক সাধন রীতির প্রবর্তন করেন। দেবদেবী, মন্দির-মসজিদ, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সর্বপ্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ তাঁরা অস্বীকার করেন। মানবদেহকে অবলম্বন করে দেহমন্দিরের মনসায়রে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভই বাউল সাধনার পরম লক্ষ্য। ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর উর্ধ্বে, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানুষের মহিমাকেই মুখ্য করে তুলেছেন বাংলার বাউল। বাউলগীতির আবেদনও তাই সার্বজনীন হয়েছে।

লালন ফকির ॥

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।

কবি পরিচয় ॥

কাঙ্গাল হরিনাথকে নব্য বাউলগানের আদিগুরুরূপে পরিগণিত করা হয়। কিন্তু বাউলগীতির এক সমৃদ্ধ রূপকার হিসাবে লালন ফকিরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কুষ্টীয়ার গোরাই নদীর তীরে ভাঁড়রা গ্রামে লালনের জন্ম। জন্মকাল ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমিত। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে লালনের আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর। জন্মসূত্রে লালন ছিলেন হিন্দু। কিন্তু উত্তরজীবনে এক সংকটাবর্তে সিরাজ সাঁই নামে জনৈক মুসলমান ফকিরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকট তাঁর বাউল সাধনার সূত্রপাত। গোঁড়া হিন্দু এবং শরীয়তী মুসলমান কোনো সমাজেই লালন গ্রহনীয় হলেন না। তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় ছিল অতি সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান। এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মের আদর্শে সাধারণ বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি এবং এই ঐক্য সাধনার জন্যই লালন ফকির কালজয়ী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে লালনগীতির গবেষণাকেন্দ্র—লালন একাডেমি গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত লালন অনুগামী বাউলবৃন্দ নিজেদের ধর্মসাধনা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এটা বাঙালীর গৌরব ও গর্বের বিষয়।

লালনের গান ও কবিপ্রতিভা ॥

বাউল সাধনার উদার মানবিক আবেদনকে তিনি সার্থকভাবে প্রচার করেছেন। লালন যেমন কৃষ্ণলীলাকে বিষয় করে গান লিখেছেন—'কোথা কানাই গেলিরে প্রাণের ভাই। একবার এসে দেখা দেরে প্রাণ জুড়াই।' তেমনি ইসলামী রীতিতেও লিখেছেন বহুগান :

> আবদুল্লার ঘরে বলো
> সেই নবীর জন্ম হলো
> মূলদেহ তাঁর কোথায় রইলো শুধাব কোথায় ॥

এই সাম্প্রদায়িক ভেদহীন উদার ধর্মচেতনা লালনকে শ্রেষ্ঠ বাউলের সম্মানে ভূষিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার বহু মনীষী লালনের কবিত্ব সাধনাকে সম্মান ও স্বীকৃতি দান করেছেন। লালনগীতির দৃষ্টান্ত :

১. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তাহার পায় ॥

২. সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ?
লালন বলে জাতির কীরূপ
দেখলাম না এই নজরে ॥

কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাইতো রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে ?…ইত্যাদি

অনুরূপ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ বহু বাউলগীতির রচয়িতা লালন। উচ্চাঙ্গের কাব্যরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাউল সাধনার গোপন তত্ত্ব। সীমা-অসীম, জীবাত্মা পরমাত্মা সম্পর্কে লালনের গানে গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে। বক্তব্যের গূঢ়তা প্রকাশ করতে গিয়ে বাউল কবি উপমা-রূপক প্রতীকের সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'—ইত্যাদি গানটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথবা

"বল কি সন্ধানে যাই সেথানে মনের মানুষ যেথানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেথানে।।"

বাউলে গানের রচয়িতা জানেন এই ব্যঞ্জনার আড়ালে কী তত্ত্বকথা নিহিত। যাঁরা তত্ত্বকথা সন্ধানী নন, তাঁরাও এরূপ পদের কাব্যরসের আস্বাদনে তৃপ্ত হবেন। জাতি ধর্ম বর্ণের কৃত্রিম ব্যবধানকে অস্বীকার করে যে ধর্মীয় উদারতার আদর্শ প্রচারে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বাউল সম্প্রদায় সেই ধর্মবোধকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন বৃহত্তর জনসমাজে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুরে ছন্দে বাণীতে লালনের পদসমূহ বাংলাসাহিত্যের সার্থক গীতাঞ্জলি।

॥ আদর্শ প্রশ্নোত্তর ॥

প্রশ্ন—(ক) চর্যাপদে তৎকালীন বাংলার যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। (খ) চর্যার সাহিত্যসম্পদ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৮+৭

উত্তর—(ক) চর্যায় বাংলার সমাজচিত্র

বাংলার আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু কবিরা ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাস কাব্যমাধ্যমে পরিবেশন করলেও জনজীবনের তাঁরা ছিলেন অতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল দ্রষ্টা। এইজন্যই এ যুগের প্রধান প্রধান ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে লোকায়ত জীবনের আন্তরিক ও বিশ্বস্ত চিত্রখানি অঙ্কিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে এরূপ চিত্র সুঅঙ্কিত। চর্যাপদ এই সত্যের ব্যত্যয় নয়। ধর্ম সাধনার জটিল নীতি-মালা চর্যাপদে রয়েছে, তবু গভীর মরমী দৃষ্টি নিয়ে চর্যার পদকর্তারা দেখেছেন বাংলার সমকালীন মানুষের দুঃখ বেদনা হাসি কান্নায় আলিম্পিত জীবনযাত্রার অন্তরঙ্গ চিত্র। উপমা রূপক-এ তাঁরা চিত্রিত করেছেন সচ্ছল ও দরিদ্র জীবনযাত্রার নানা দিক।

চর্যার সমকালীন বাংলার নগর সমাজে শিক্ষিত সম্পন্ন বাঙালী নিমগ্ন ছিল বিলাসব্যসনে, অসংযত ভোগবাসনায়। অপরদিকে বৃহত্তর পল্লীসমাজে, নগরের বাইরে পর্বতাঞ্চলে নিম্নবিত্ত বাঙালীর দুঃখ অভাব ছিল জীবনের নিত্যসঙ্গী। সচ্ছল সম্পন্ন নগরবাসীরা সাড়ম্বরে বিবাহাদি অনুষ্ঠান পালন করত। বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করত। খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেত। মদ্যপান করত। অন্যদিকে নিম্নবিত্তের বহু মানুষের দুবেলা দুমুঠো আহার জুটত না। পদ্মের ডাঁটা খেয়ে খিদে দূর করত। নিদারুণ অভাবে অপরাধমূলক কাজ করত। ক্ষুধাতুর শিশুর চোখ ছিল কোটরাগত, শরীর শীর্ণ। ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা জল ধরে। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ পোষ্যের সংখ্যা বহু। পরিধানের বস্ত্র জীর্ণ। ভগ্নজীর্ণ কুঁড়েঘর। বিভিন্নপদে এমনিতর দারিদ্র্যের চিত্র প্রকট হয়ে ফুটছে। "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী", ইত্যাদি পদটিতে রূপকের আধারে জনজীবনের দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ চিত্রণ রয়েছে। নিম্নবর্ণের জীবনচিত্র

বর্ণনার এই প্রত্যক্ষতায় বাংলার আদি সাহিত্যের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হবে। সেদিনের সমাজে বর্ণ বৈষম্য ছিল প্রবল। উচ্চবর্ণের কাছে অচ্ছুত অন্ত্যজ ছিল ডোম, নিষাদ। নগরের বাইরে পর্বতাঞ্চলে তাদের বাস। নৌকা ছিল তাদের যান। বাঁশের বা বেতের চাঙাড়ি, চুপড়িধামা, কুলা, বাঁশের তাঁত প্রভৃতি তৈরী করে, কার্পাসের চাষ করে, তাঁতে বস্ত্র বুনে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। নারী পুরুষ উভয়ই কাজ করত। ডোমনারীদের মধ্যে কেউ কেউ নৃত্য-বিদ্যায় নিপুণা ছিল। একাধিক চর্যায় রয়েছে শুল্ক সংগ্রহকারীদের উপদ্রবের কথা, শান্তিরক্ষীদের অত্যাচারের কথা। একথা স্বীকার করতেই হবে দশম-দ্বাদশ শতকের পূর্বভারতের জনজীবন-যাত্রার মূল্যবান দলিল চর্যাপদ।

চর্যার সাহিত্যসম্পদ ॥

প্রধানতঃ ধর্মকৃত্যই চর্যাপদাবলীর উপজীব্য। চর্যার অর্থই কর্মানুষ্ঠান। মহাযানের সাধনপদ্ধতি রহস্যময় ইঙ্গিতে পদকর্ত্তারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং চর্যাপদে সাহিত্যরসতৃপ্তি না ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চর্যাপদাবলীর বৌদ্ধসিদ্ধা-চার্যগনের মুগ্ধদৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে নদীপ্রান্তর অরণ্য শোভিত বাংলাদেশ, নরনারীর জীবনের মিলনাবেশ, বিচ্ছেদ যাতনা। যে সব পদে এই অনুভব রয়েছে, সেসব পদেই প্রকাশিত হয়েছে কবিত্বশক্তি পদকর্ত্তার এই ব্যক্তিগত হৃদয় উপলব্ধি চকিত প্রকাশ লাভ করেছে "তিন না চ্ছুপই হরিনা পিবই ন পানী। হরিণ হরিণীর নিলয় না জানী।" ইত্যাদি পদটিতে। পদটির সন্ধ্যাভাষার কুহেলিকার মধ্যেও নরনারীর জীবনের নিবিড় উত্তাপ, অনুভূত হয়েছে। এই উত্তাপ ও অনুভূতিতে পদটি কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। বহু চর্যায় পদকর্ত্তারা চিত্রকল্পনায়, রূপরচনায় অপূর্ব কাব্যস্বাদ সৃষ্টি করেছেন। একাধিক পদে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার নদীতরঙ্গ, পুষ্পশোভা, ছবির মতো সুন্দর গৃহাঙ্গন, জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রি, মধুময় বাসন্তী প্রকৃতি। রূপক, উপমা ব্যবহারে, ভাষা ভঙ্গীমায়, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে একাধিক চর্যার সাহিত্যগুন উল্লেখযোগ্য। একটি চর্যায় কবি করুণাকে ডমরুধ্বনি কল্পনা করে গীতিকবির কল্পনা-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানকে জ্যোৎস্না, কায়াকে নৌকা কল্পনায় সাহিত্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাপদের ছন্দ-বৈচিত্র্য কম। পয়ার ও ত্রিপদীর রূপ দেখা যায় চর্যার ছন্দবিন্যাসে। অধিকাংশ

পদ ষোলো মাত্রার 'চউপাই' ছন্দে সজ্জিত। পদকর্তাদের লক্ষ্য ছিল গ্রামীন লোকসমাজ। তাই তাঁরা পরিচিত ছন্দ ও পরিবেশকে বাহন করেছিলেন ধর্ম-বিশ্বাসকে বহুজন গ্রাহ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও চিত্র সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ গীতিধর্মী চর্যাপদাবলী প্রাচীন বাংলার স্মরণীয় সাহিত্যসম্পদ। চর্যা ধর্মশাস্ত্র হয়েও সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

❋

॥ প্রশ্নমালা ॥

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ॥

১. বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার উদ্ভব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

২. বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন কোন্ গ্রন্থ থেকে? বাংলা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. **টীকা লেখো ঃ** (ক) প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য (খ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য (গ) আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ॥

১. বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের রচনা কী? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

২. চর্যাপদে তৎকালীন বাংলার যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। চর্যার সাহিত্য সম্পদ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩. চর্যা পদাবলী মূলতঃ ধর্মশাস্ত্র হলেও তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে—এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪. **টীকা লেখো ঃ** সন্ধ্যাভাষা।

তুর্কী বিজয় এবং তার ফলশ্রুতি ॥

১. তুর্কীদের বাংলা বিজয়ের জন্য দায়ী তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা ও সামাজিক অব্যবস্থা—এই মন্তব্যটি বিচার করে তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতি কী হয়েছিল আলোচনা করো।

২. তুর্কী বিজয়ের পূর্বের এবং তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পরের বাংলার সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করো।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি কার লেখা? কাব্যখানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলা ভাষায় এই কাব্যের বিশেষ মূল্য আছে কেন? কাব্যখানার অন্য কোনো নাম ছিল কি? **(উঃ মাঃ ৮১)**

২. বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় সম্বন্ধে এযাবৎ কি কি তথ্য জানা গেছে ? এ কাব্যের আবিষ্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিচয় দিয়ে এই কাব্যের কাব্যোৎকর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের গুরুত্ব দেখাও। (উঃ মাঃ ৮৩)

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ।।

১. বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বলে গ্রহণ করার কারণ কি ? বিদ্যাপতির জীবন ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো। পরের যুগের কোন্ বাঙালী কবির ওপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল ?

২. পদাবলীর চণ্ডীদাসের পরিচয় দাও। চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভায় বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো। (উঃ মাঃ ৮২)

৩. বিদ্যাপতির পদাবলীর রচনা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো। (উঃ মাঃ ৮২)

৪. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্য তুলনা করলে কি কি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায় লেখো।

৫. বিদ্যাপতির কবি প্রতিভার পরিচয় দাও। বাংলাদেশে তাঁর পদাবলীর সমাদরের কারণ কী ? (উঃ মাঃ ৮৪)

কৃত্তিবাস ।।

১. কৃত্তিবাসের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় দাও। কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করো। (উঃ মাঃ ৭৮)

২. কৃত্তিবাসের কাব্যকে রামায়ণ মহাকাব্য না বলে রামায়ণ পাঁচালী বলা হয় কেন ? কৃত্তিবাসের মৌলিকতা নির্ণয় করো।

৩. কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ বলা কতদূর সঙ্গত ? 'বাঙালীর গৃহজীবনের কথা বলেছেন বলেই কৃত্তিবাস বাঙালীর প্রিয়'— মন্তব্যটি পর্যালোচনা করো।

৪. বাঙালী জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব কতখানি, নির্ণয় করো। (উঃ মাঃ '৮০)

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥

১. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

টীকা লেখো : গুণরাজখান, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু।

মঙ্গলকাব্য ॥

১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ আলোচনা করে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

২. বাঙলার প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির নাম উল্লেখ করো। মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ কি? মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তৎকালীন সমাজ-জীবনের পরিচয় দাও।

মনসামঙ্গল ॥

১. মনসামঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখো। এ ধারার প্রধান প্রধান কবি কারা? একজন কবির কবি-প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কবি-প্রতিভার পরিচয় দাও।

৩. বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম কী? তাঁর জীবন ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৪. মনসামঙ্গল কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দাও।
(উঃ মাঃ ৮২)

৫. **টীকা লেখো :** চাঁদ সদাগর, বেহুলা।

সমাজজীবনে ও সাহিত্যে চৈতন্যদেব ॥

১. বাংলা সাহিত্যের কোন্ শতককে চৈতন্যযুগ বলা হয়? এই যুগকে চৈতন্য-যুগ বলার কারণ বুঝিয়ে লেখো।

২. বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করো। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় চৈতন্যপ্রভাব কতটা পড়েছিল, লেখো।
(উঃ মাঃ ৮১, ৮৩)

৩. বাংলার সমাজজীবন ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

চণ্ডীমঙ্গল ॥

১. মুকুন্দরামের দুঃখপূর্ণ ব্যক্তিজীবনের পরিচয় দাও। চরিত্রাঙ্কনে ও করুণ

রসসৃষ্টিতে কবির দক্ষতা আলোচনা করো। (উঃ মাঃ ৮০)

২. চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো। এ ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম উল্লেখ করো। একজন কবির কবি-প্রতিভা সংক্ষেপ আলোচনা করো। (উঃ মাঃ ৮২)

৩. চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের পরিচয় দিয়ে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, দেখাও। (উঃ মাঃ ৭৮)

৪. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পুরাতন পুঁথিতে কীভাবে উল্লিখিত আছে? কবির পরিচয় ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৫. **টীকা লেখো :** দ্বিজমাধব, ধনপতি সদাগর, সারদামঙ্গল।

চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ॥

১. বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্ রচনাটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর কারণ-সহ লেখো। (উঃ মাঃ ৭৮, ৮০)

২. চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব কোথায়? চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কে? তাঁর কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করো।

৩. দুটি প্রধান চৈতন্য চরিত কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে লেখো (উঃ মাঃ ৮৩)

৪. **টীকা লেখো :** চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, গৌরচন্দ্রিকা।

বলরামদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদাবলী ॥

১. জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন আলোচনা করে জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও। (উঃ মাঃ ৮০)

২. গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কি? তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলার কারণ কি, আলোচনা করো। (উঃ মাঃ ৭৯)

৩. জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় দাও।

৪. **টীকা লেখো :** দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, বলরাম দাস।

ধর্মমঙ্গল ॥

১. ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিদের পরিচয় সংক্ষেপে লেখো।

২. ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখো। এ কাব্যের সর্বপ্রধান কবির কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দাও।

৩. **টীকা লেখো :** রূপরাম চক্রবর্তী, লাউসেন।

মহাভারত ॥

১. কাশীরামদাসের কবিজীবনী ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দাও।

২. **টীকা লেখো :** শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

আরাকান রাজসভার কবি ॥

১. দৌলতকাজীর জীবন ও কাব্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

২. সৈয়দ আলাওলের জীবন ও কাব্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৩. আরাকান রাজসভার সাহিত্য সাধনা বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৪. **টীকা লেখো :** দৌলত কাজী, সতী ময়না, লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী।

ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল ॥

১. ভারতচন্দ্রের জীবন ও কবি-প্রতিভার পরিচয় দাও।

২. অন্নদামঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও। এ কাব্যের বৈশিষ্ট ও কাব্যোৎকর্ষ নির্ণয় করো।

৩. ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমকালীন যুগপ্রভাব কীভাবে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করো। ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা কোথায় দেখাও।

সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী এবং বাউল ॥

১. শাক্তপদাবলী ও বাউলগীতির সামাজিক পটভূমি আলোচনা করো।

২. রামপ্রসাদের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৩. কমলাকান্তের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৪. বাউলগীতির বৈশিষ্ট্য কী? লালন ফকিরের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৫. **টীকা লেখো :** কমলাকান্ত, আগমনী গান, বিজয়া সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত।

॥ নির্দেশিকা ॥

(শব্দের পাশে উল্লিখিত হয়েছে পৃষ্ঠা সংখ্যা)